মুক্তি-সংগ্রাম

(১৯৩৫-৪২)

সুভাষচন্দ্র বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল ইংরাজী হইতে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশ—২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৩

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড
৫নং চিন্তামণি দাস লেন

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক—ফাইন আর্ট টেম্পল

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

ভূমিকা

গত অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী ভারতের নব অভ্যুত্থান ও মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন-সংগ্রামের মধ্যেই প্রতিফলিত হইয়াছে। এই মহা-জাতির সেই গৌরবময় ইতিহাস যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে নেতাজীকে বুঝিতে হইবে, তাঁহার লেখনী ও বাণী হইতে প্রেরণা ও শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর "মুক্তি-সংগ্রাম" এ-বিষয়ে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহা ইংরাজী ভাষায় রচিত এবং কয়েক মাস পূর্বে ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলার জনসাধারণের স্বার্থে বইখানি বাংলা ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি ও উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। নেতাজীর "মুক্তি-সংগ্রাম" ১৯৩৫ সালে প্রথম ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়—এখন ইহা ভারতেও পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকখানি সেই গ্রন্থেরই শেষাংশ। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগসন্ধিক্ষণের সংকটময় অধ্যায় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নায়কের স্বলিখিত সেই ইতিহাস পড়িবার অপূর্ব সুযোগ বাংলার নরনারী ইহাতে পাইবেন। কেবল তাহা নহে, ভবিষ্যতের সন্ধান ও পথের ইঙ্গিতও নেতাজী এই পুস্তকে দিয়াছেন।

নেতাজীর পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের ন্যায় এই পুস্তকখানিও ইউরোপে ইংরাজী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ইহার প্রণয়নকালে তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই সৌজন্যে ইহা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল।

ভারত হইতে ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জার্মাণীতে পৌঁছিয়াই সুভাষচন্দ্র বহির্ভারতে আজাদ হিন্দ্ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনের পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কিছুদিনের জন্য বিশ্রামলাভের আশায় তিনি অস্ট্রিয়াস্থিত বাদগাস্টাইন শহরে যান। সেখানে এই পুস্তক রচনা আরম্ভ হয়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব-এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণের জন্য নেতাজীকে সাবমেরিণযোগে বিপদসংকুল সমুদ্রযাত্রা করিতে হয়। ইউরোপ-ত্যাগের পূর্বেই তাঁহার অতি-কর্মব্যস্ত জীবনের অবসর সময়ে তিনি এই পুস্তক রচনা শেষ করেন।

নেতাজীর কর্মনীতি ও চিন্তাধারার মৌলিকত্ব, তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ ও জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য আমাদের এক নূতন আলোকের সন্ধান দেয়। তাঁহার সেই সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত মত ও পথই আজ 'সুভাষবাদ'রূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সুভাষবাদের অন্তর্নিহিত ভাব ও অর্থ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা যাহাতে সাধারণ বাঙালী পাঠকের পক্ষে সহজ হয়, সেই উদ্দেশ্যে নেতাজীর তিনটি অনন্যসাধারণ প্রবন্ধ এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করা হইল। প্রথমটি 'সংগ্রাম ও তাহার পর'—১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ। দ্বিতীয়টি, 'ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রয়োজনীয়তা'—১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে কাবুলে লিখিত হইয়াছিল। সেখান হইতে একজন বিশেষ বার্তাবহের মারফতে নেতাজী এই প্রবন্ধটি আমার স্বর্গত স্বামীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তৃতীয়টি, 'ভারতের মৌলিক সমস্যা' সম্বন্ধে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতাজীর বক্তৃতা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত রূপ, গতি ও লক্ষ্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে এবং সুভাষবাদের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ংগম করিতে নেতাজীর এই পুস্তক যথেষ্ট সহায়তা করিবে। বাঙালী পাঠকসমাজে এই বইখানি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমি আশা রাখি। জয় হিন্দ্‌!

বিভাবতী বসু

১, উডবার্ণ পার্ক
কলিকাতা
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৩

প্রথম পরিচ্ছেদ*

১৮৫৭ সনের পরবর্তী ভারতবর্ষ : সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পলাশীর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৭৫৭ সনে। এই যুদ্ধের ফলে বাংলার তৎকালীন স্বাধীন নৃপতি নবাব সিরাজদ্দৌলা ক্ষমতাচ্যুত হন। ব্রিটিশ শক্তির ভারত-বিজয় পর্ব তখন থেকেই শুরু হয়েছিল বটে, তবে ধীরে ধীরে—এবং ক্রমানুসারী কয়েকটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়েই সে-কাজ অগ্রসর হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শাসনাধিকারই ব্রিটিশ-শক্তির হাতে এল, রাজনৈতিক শাসনাধিকার রইল নবাব মীরজাফরের হাতে। শেষ মুহূর্তে নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইনি ব্রিটিশ-পক্ষে যোগদান করেছিলেন। ক্রমিক কয়েকটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়েই বাংলার সামগ্রিক শাসনভার ব্রিটিশ-শক্তির হাতে এসেছে। ঠিক তেমনি ভাবেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছিল। ধীরগতিতে এইভাবে যখন একদিকে একটার পর একটা জায়গা দখলের কাজ চলছে, অন্যদিকে ব্রিটিশ-শক্তি তখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লীশ্বরের আধিপত্য স্বীকার করে চলছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারত-বিজয়ের ব্যাপারে ব্রিটিশ-পক্ষ যে শুধু অস্ত্রশস্ত্রেরই সাহায্যগ্রহণ করেছে তা নয়, উৎকোচ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং সর্বপ্রকার দুর্নীতি, এর কোনওটিকেই তারা বাদ দেয়নি। অস্ত্রের থেকে এগুলি আরও বেশী মারাত্মক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ক্লাইভের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে এঁকে লর্ড-উপাধি প্রদান করা হয়। ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করেছেন যে, ইনি জালিয়াতির অপরাধে অপরাধী ছিলেন। ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের অন্যতম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধেও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল। কমন্স-সভার সদস্য এডমণ্ড বার্ক তাঁর

---

* ১৯৩৪ সনে ইংরিজী ভাষায় এর পূর্ববর্তী অধ্যায় রচিত হয়। ১৯৩৪ সন পর্যন্ত বিস্তৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে তাতে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অংশ লেখা হয়েছে ১৯৪৩ সনে; তাতে আধুনিক কালের ঘটনাবলীর আলোচনা সংযোজিত হয়েছে—লেখক।

বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন যে, তিনি "সাঙ্ঘাতিক অন্যায় এবং দুর্নীতি"র অপরাধে অপরাধী।

আমাদের পূর্ববর্তীদের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভ্রান্তি এবং মূঢ়তা হলো এই যে, ভারতে আগত ব্রিটিশদের চরিত্র এবং কী ভূমিকা তারা গ্রহণকরবে তা তাঁরা গোড়াতেই বুঝতে পারেননি। অতীতকালে অসংখ্য উপজাতি ভারতবর্ষে এসে প্রবেশ করেছে, এবং পরে ভারতবর্ষকেই তাদের দেশ বলে গ্রহণ করেছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা হয়তো ভেবেছিলেন যে, ব্রিটিশরাও ঠিক এমনই আর-একটি উপজাতি। অনেক পরে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, ব্রিটিশরা শুধু রাজ্যজয় আর লুণ্ঠন চালাতেই এদেশে এসেছে, বসবাস করতে আসেনি। সারা দেশের লোক সেকথা বুঝতে পারবামাত্রই ১৮৫৭ সনে একটি বিরাট বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তাকে "সিপাহী-বিদ্রোহ" আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাতে সত্যের বিকৃতি ঘটেছে। ভারতবাসীরা মনে করেন যে, এই বিপ্লবই হলো তাঁদের প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম। ১৮৫৭ সনের মহান বিপ্লবে ব্রিটিশরা এদেশ থেকে প্রায় বিতাড়িত হতে চলেছিল। কিন্তু—খানিকটা তাদের উন্নততর রণনৈপুণ্যের জন্য এবং খানিকটা ভাগ্যক্রমে—শেষ পর্যন্ত তারা জয়লাভ করতে সমর্থ হলো। তারপর শুরু হলো এক বিভীষিকার অধ্যায়, ইতিহাসে এর তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। ব্যাপকভাবে হত্যাপর্ব অনুষ্ঠিত হতে লাগলো; হাত পা বেঁধে নির্দোষ নরনারীকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে হত্যা করতেও ব্রিটিশরা তখন পেছপা হয়নি।

১৮৫৭ সনের বিপ্লবের পর ব্রিটিশ-পক্ষ উপলব্ধি করতে পারল যে, নিছক পশুশক্তির সাহায্যে খুব বেশীদিন ভারতবর্ষকে অধীন রাখা যাবে না। সুতরাং দেশকে তারা নিরস্ত্রীকৃত করতে অগ্রসর হলো। আমাদের পূর্ববর্তীদের দ্বিতীয় মারাত্মক ভ্রান্তি এবং মূঢ়তা হলো এই যে, সেই নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার কাছে তাঁরা নতিস্বীকার করলেন। এত সহজে যদি তাঁরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ না করতেন তো ১৮৫৭ সনের পরবর্তী ইতিহাসের চেহারা হয়তো অন্যরকম হয়ে দাঁড়াত। গোটা দেশটাকে এইরকম পুরোপুরিভাবে নিরস্ত্রীকৃত করবার ফলেই ব্রিটিশ-শক্তির পক্ষে পরবর্তীকালে একটি সুদক্ষ এবং আধুনিক-কালোপযোগী ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ভারতবর্ষকে পদানত করে রাখা সম্ভবপর হয়েছে।

নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গেই নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সরকার, এ-সরকারের কার্যকলাপ তখন সরাসরি লন্ডন থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাঁদের "ভেদসৃষ্টির সাহায্যে শাসনপরিচালনা" নীতির প্রবর্তন করলেন। তখন থেকেই এই নীতির

গোড়াপত্তন, এবং ১৮৫৭ সন থেকে অদ্যাবধি এই নীতিটিই হলো ব্রিটিশ-শাসনের মূলভিত্তি। ১৮৫৭ সনের পর থেকে প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ এই নীতি অনুযায়ী ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশকে সরাসরি ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রণে এবং বাকী এক চতুর্থাংশকে দেশীয় নৃপতিবর্গের অধীনে রেখে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। সেইসঙ্গে ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের বড় বড় জমিদারদের প্রতিও ব্রিটিশ সরকার যথেষ্টই পক্ষপাত প্রদর্শন করতে লাগলেন। ১৮৫৭ সনের পর দেশীয় নৃপতিদের প্রতি ব্রিটিশ সরকার যে মনোভাব দেখিয়ে এসেছেন, এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৫৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে যেখানে সম্ভব নৃপতিদের উচ্ছেদ করে তাঁদের রাজ্যগুলির প্রত্যক্ষ শাসনব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের নীতি। ১৮৫৭ সনের বিপ্লবে ভারতীয় শাসকদের মধ্যে কয়েকজন—যথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শৌর্যশালিনী ঝাঁসীর রাণী—ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন বটে, তবে অনেকেই নিরপেক্ষ ছিলেন অথবা সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ-পক্ষে যোগদান করেছিলেন। এই শেষোক্তদের মধ্যে একজন হলেন নেপালের মহারাজা। সেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশদের মাথায় ঢুকল যে, নৃপতিবর্গকে অধিকারচ্যুত করাটা বোধ হয় আর ঠিক হবেনা; তার চাইতে তাঁদের সঙ্গে বরং একটা মৈত্রী এবং বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করাই ভাল। তাতে করে ব্রিটিশ-শক্তি কখনও কোনও অসুবিধেয় পড়লে এই নৃপতিদের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করা যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে দেশীয় নৃপতিদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের যে-নীতি ব্রিটিশ-শক্তি গ্রহণ করেছে তার গোড়া-পত্তন হয়েছে ১৮৫৭ সনে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে অবশ্য ব্রিটিশরা বুঝতে পারল যে, নিছক দেশীয় নৃপতিবর্গ এবং বড় বড় জমিদারদেরকে জনসাধারণের বিরুদ্ধে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে আর ভারতবর্ষকে অধীন রাখা যাবেনা। সুতরাং ১৯০৬ সনে তারা আবার এক মুসলিম-সমস্যার সৃষ্টি করল। লর্ড মিণ্টো* তখন ভাইসরয়। এর আগে আর ভারতবর্ষে এরকম কোনও সমস্যার অস্তিত্বও ছিলনা। ১৮৫৭ সনের মহান বিপ্লবে হিন্দু এবং মুসলমানরা সম্মিলিতভাবেই ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল। বাহাদুর শাহ্ মুসলমান; কিন্তু তাঁরই পতাকাতলে সমবেত হয়ে ভারতবাসীরা তাদের প্রথম মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

---

* লর্ড মিণ্টো যখন ভাবতবর্ষের ভাইসরয়, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় লর্ড মর্লে তখন ভারত-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত। এই লর্ড মর্লেই বলেছিলেন যে, লর্ড মিণ্টো ১৯০৬ সনে "মুসলিম-খরগোস ছেড়ে দিয়েছেন"।

গত মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা দেখল যে, ভারতীয় জনসাধারণকে আরও কিছু কিছু রাজনৈতিক সুবিধা দেওয়া দরকার; কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও তারা বুঝতে পারল যে, জনসাধারণের থেকে শুধুমাত্র মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রাখাটাই যথেষ্ট নয়। অতঃপর তারা হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেই বিভেদসৃষ্টির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলো। এইভাবেই ১৯১৮ সনে তারা বর্ণ-সমস্যার সৃষ্টি করল এবং রাতারাতি তথাকথিত অনুন্নত-শ্রেণীর মুরুব্বী এবং মুক্তিদাতা সেজে বসল। ১৯৩৭ সন পর্যন্ত ব্রিটেন আশা করে এসেছিল যে, দেশীয় নৃপতিবর্গ, মুসলিম-সমাজ এবং তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর হিতৈষী সেজেই তারা ভারতবর্ষকে ভেদবিভক্ত করে রাখতে পারবে। ১৯৩৫ সনের নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে কিন্তু তারা সবিস্ময়ে বুঝতে পারল যে, তাদের সমস্ত ছলচাতুরী আর সকল ধাপ্পাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সেইসঙ্গে তারা আরও বুঝল যে, সমগ্র জাতি এবং জাতির সর্বাংশের মধ্যেই জাতীয়তাবাদী একটি সুতীব্র অনুভূতি সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। ফলতঃ ব্রিটিশ-নীতি এখন তার সর্বশেষ আশাকে এসে আশ্রয় করেছে। ভারতীয় জনসাধারণকে যদি বিভক্ত না করা যায় তো দেশকে—ভারতবর্ষকে—ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্ত করতে হবে। এই যে পরিকল্পনা—যার নাম দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান—জনৈক ইংরেজের উর্বর মস্তিষ্ক থেকেই এর উদ্ভব হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও এর নজির রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে যে-সিংহল ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল, বহুদিন পূর্বেই ভারতবর্ষ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আয়ার্ল্যান্ডও চিরকাল একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ছিল; বিগত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সেই আয়ার্ল্যান্ডকে আলস্টার এবং আইরিশ ফ্রী স্টেটে বিভক্ত করা হয়। ১৯৩৫ সনের নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হবার পর ব্রহ্মদেশকেও ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। এবং বর্তমান মহাযুদ্ধের ফলে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তা যদি না হতো তো প্যালেস্টাইনকেও বিভক্ত করে একটি ইহুদী রাষ্ট্র এবং একটি আরব রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হতো; মাঝ বরাবর থাকত ব্রিটিশ করিডর। পাকিস্তান-সৃষ্টি অথবা ভারতবিভাগের পরিকল্পনা করেছে ব্রিটিশ-পক্ষই; অতঃপর এই পরিকল্পনার স্বপক্ষে তারা ব্যাপক এবং নিপুণ প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই একটি মুক্ত এবং স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র কামনা করে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্বয়ং একজন মুসলমান, এবং পাকিস্তান-পরিকল্পনার পিছনে ভারতীয়

মুসলমানদের একটা সামান্য অংশেরই সমর্থন রয়েছে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও সারা পৃথিবী জুড়ে ব্রিটিশ-পক্ষের যে প্রচারকার্য চলছে তাতে করে এই ধারণাই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পিছনে ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন নেই এবং ভারত-বিভাগই তারা চায়। ব্রিটিশ-পক্ষ নিজেরাও জানে যে, যা তারা প্রচার করছে তা সর্বৈব মিথ্যা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আশা করে, বারংবার যদি সেই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করা যায় তবে বিশ্ব-বাসীকে তারা সেই মিথ্যা-কথাটাই বিশ্বাস করাতে পারবে। পাকিস্তান-পরিকল্পনা সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে তারা চেয়েছিল যে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে একটি হিন্দু-ভারত এবং একটি মুসলিম-ভারতের সৃষ্টি করা হবে, তা সে-ব্যবস্থাটা যতই না কেন উদ্ভট মনে হোক। ইংরেজদের উর্বর মস্তিষ্ক তারপর এ-পরিকল্পনাকে আরও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে, এবং আপন ইচ্ছানুযায়ী চলতে পারলে ভারতবর্ষকে তারা এখন শুধু দুটিমাত্র রাষ্ট্রেই নয়, পাঁচ-ছ'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে ছাড়বে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রিটিশ রাজনীতিকরা বলছেন যে, দেশীয় নৃপতিবর্গ যদি ভারতবর্ষের অবশিষ্টাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চান তো তাঁদের জন্যে রাজস্থান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করতে হবে। শিখরা যদি আলাদা হয়ে যেতে চায় তো তাদের জন্যেও খালসীস্থান বলে পৃথক একটি রাষ্ট্র থাকা দরকার। আর এই চতুর ইংরেজরা এখন আবার পাঠানদের জন্যেও বিশেষ দরদ দেখাচ্ছে। পাঠানরা হলো ভারতীয় মুসলমানদেরই একটা অংশ, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এদের বাস। ইংরেজরা বলছে যে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাঠানীস্থান বলেও পৃথক একটি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ রাজনীতিকরা বর্তমানে এই পাঠানীস্থান-পরিকল্পনা নিয়ে খুব মেতে উঠেছেন মনে হয়। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যারা সর্বাধিক অশান্তিসৃষ্টিকারী—অর্থাৎ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা এবং ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী স্বাধীন উপজাতিসমূহ—ব্রিটিশ রাজনীতিকরা আশা করছেন যে, এই পাঠানীস্থান-পরিকল্পনার সাহায্যে তাদের একাংশকে দলে টানা যাবে। শুধু তাই নয়, আফগান জনসাধারণের সহানুভূতিও এই পথেই অর্জন করা যাবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

পাকিস্তান-সৃষ্টির পরিকল্পনাটি যে একটি উদ্ভট এবং অবাস্তব পরিকল্পনা তাতে সন্দেহ নেই। এ-কথা বলবার একাধিক কারণ বর্তমান। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক—সর্বদিক থেকেই ভারতবর্ষ অবিভাজ্য। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলেই

হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীরা এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে রয়েছে যে পরস্পরের কাছ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, জোর করে যদি কতকগুলি মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয় তো তাতে করে সেইসমস্ত রাজ্যের মধ্যে নতুন নতুন কতকগুলি সংখ্যালঘু-সমস্যার সৃষ্টি করা হবে। তার ফলে নতুন করে আবার কিছু জটিলতা দেখা দেবে। চতুর্থতঃ, হিন্দু ও মুসলিমরা যদি না পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তবে তারা স্বাধীনতা লাভ করতে পারবেনা; স্বাধীন এবং অখন্ড ভারত-রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তিতেই শুধু সেই ঐক্য সম্ভব। স্বাধীন-পাকিস্তান একটা অসম্ভব পরিকল্পনা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়,—সকলের উপরেই যাতে ব্রিটিশ-শক্তির প্রভুত্ব বজায় থাকে তার জন্যে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করাই এর উদ্দেশ্য। মুসলিম লীগের সভাপতি এবং পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা মিঃ জিন্না তাঁর সাম্প্রতিক কথাবার্তায় যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য; তাতে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ব্রিটিশ-শক্তির সাহায্য পেলে তবেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা এবং পাকিস্তানকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সংগ্রাম চলছে, বস্তুতঃ ১৮৫৭ সনের মহান বিপ্লবের সঙ্গে তার যোগসূত্র বর্তমান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চল্লিশ বৎসরের যে সংগ্রাম, সংবাদপত্র এবং সভাসমিতির আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ১৮৮৫ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর, এই আন্দোলন সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এসে একটি সুসংহত রূপ লাভ করে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে এক নব-জাগরণ পরিলক্ষিত হয়েছিল, সংগ্রামের নূতন নূতন পন্থাও তখন আবিষ্কৃত হয়। তারই দরুণ প্রথম কুড়ি বছরে আমরা দেখেছি যে, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে একদিকে যেমন ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করা হয়েছে, অন্যদিকে দেখা দিয়েছে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ। অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে বিগত মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা একবার মরীয়া হয়ে চেষ্টা করেছিলেন; জার্মাণী, অস্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী এবং তুরস্ক তখন আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধনিরত। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবীদের তখন দমন করা হয়। যুদ্ধের পর আন্দোলন চালাবার ব্যাপারে ভারতবর্ষের একটি নূতন অস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দিল। এবং সেই প্রয়োজনের মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা আইন অমান্যের অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস গত বাইশ বছর ধরে দেশীয় রাজ্যসমূহ-সমেত সারা দেশে একটি শক্তিশালী সংস্থা গড়ে তুলেছে। সুদূরতম গ্রামাঞ্চলে এবং জনসাধারণের সর্বাংশের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান একটি রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করেছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে, অস্ত্র ছাড়াও যে কিভাবে শক্তিশালী শত্রুর উপরে আঘাত হানা যায়, ভারতবর্ষের জনসাধারণ তা শিখে নিয়েছে, এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দেখিয়ে দিয়েছে যে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সাহায্যে শাসন-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়া যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, ভারতবর্ষে এখন একটি সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক সংস্থা রয়েছে; সুদূরতম গ্রামাঞ্চলেও তার প্রভাব বর্তমান। এই সংস্থার মারফতে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনা করা যেতে পারে এবং এরই সাহায্যে পরে একটি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন সম্ভব।

ভারতবর্ষের তরুণ-সম্প্রদায় কিন্তু গত বাইশ বছরের অভিজ্ঞতার থেকে এই শিক্ষাই লাভ করেছেন যে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা বিদেশী শাসন-ব্যবস্থাকে বাধাপ্রদান অথবা পঙ্গু করে দেওয়া সম্ভব হলেও বলপ্রয়োগ ছাড়া তার উচ্ছেদ অথবা অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। এই অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হয়েই জনসাধারণ আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ক্ষেত্র থেকে সক্রিয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সরে আসছে। নিরস্ত্র ভারতবাসীরা যে আজ রেল-পথ, টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের যোগাযোগ-ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিচ্ছে,—থানা, ডাকঘর আর সরকারী ভবনে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, এবং ব্রিটিশ-প্রভুত্বের অবসান ঘটানোর জন্যে যে তারা আরও বহুপ্রকার বলপ্রয়োগ করছে, এমন খবর আপনারা পড়েছেন এবং শুনেছেন। সে শুধু এইজন্যেই। সক্রিয় প্রতিরোধ যখন সশস্ত্র বিপ্লবে রূপান্তরিত হবে, তখনই আসবে চূড়ান্ত পর্যায়। ভারতে ব্রিটিশ-শাসনেরও তখন অবসান ঘটবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৯৩৫এর জানুয়ারী থেকে ১৯৩৯এর সেপ্টেম্বর

১৯৩৪ সনের নবেম্বর মাসের শেষে, ইংরেজীতে মূলগ্রন্থখানির রচনাকার্য শেষ হবার অব্যবহিত পরেই, মা'র কাছ থেকে একটি তার পেয়ে আমাকে বিমানযোগে ভারতবর্ষ অভিমুখে রওনা হতে হয়। তারে আমাকে জানানো হয়েছিল যে, বাবা মৃত্যুশয্যায়। কলকাতা পৌঁছতে আমার একদিন দেরী হয়ে যায়। বিমানঘাঁটিতে নেমে দেখি, শক্তিশালী একটি পুলিশদল আমার জন্যে অপেক্ষা করছে; তারা আমাকে গ্রেপ্তার করে। বাড়িতে সবাই তখন শোক-সন্তপ্ত। চিকিৎসার জন্য ছ' সপ্তাহ বাদে আমি ইউরোপে ফিরে যাই; এই ছ' সপ্তাহ আমাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল।

এর কিছুদিন আগে ভারতের পার্লামেণ্ট অর্থাৎ ভারতীয় আইন-সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভারতে থাকাকালীন আমি দেখতে পাই যে, সেই নির্বাচনই সকলের আলাপ-আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাইসরয় লর্ড উইলিংডনের আশাকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে কংগ্রেস দল এ-নির্বাচনে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। তাতে করে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, লর্ড উইলিংডনের গবর্ণমেণ্ট ১৯৩২ সনের পর থেকে কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে বিবিধ দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পিছনে জনসাধারণের অধিকাংশেরই সমর্থন বর্তমান। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেসের আইনসভাগত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ভার এ-সময়ে গান্ধীপন্থীদের হাতে ন্যস্ত ছিল; ১৯২৩-২৪ সনে তা ছিলনা। ১৯৩৫ সনে পরবর্তী বারো মাস কালের জন্য, কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। মহাত্মা গান্ধীর ইনি একজন গোঁড়া সমর্থক; সুতরাং একনিষ্ঠভাবে তিনি গান্ধীপন্থাকে আঁকড়ে থাকবেন, এইটেই আশা করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতের জন্য একটি নূতন শাসনবিধি গ্রহণই হলো ১৯৩৫ সনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। বিধিটির নাম ১৯৩৫ সনের ভারতশাসন আইন। দু বছর পরে অর্থাৎ ১৯৩৭ সনে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানকালে এই শাসনব্যবস্থা কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। কাগজেকলমে এই

শাসনব্যবস্থাই এখনও পর্যন্ত চালু রয়েছে বটে, তবে প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বর্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকেই এ-ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয়। ভারতবর্ষের জনমত, এবং বিশেষ করে কংগ্রেস, একবাক্যে এই নূতন শাসনবিধিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার কারণ এটা স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের পরিকল্পনা নয়, আসলে এটা নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের দেশীয় নৃপতিবর্গ এবং ভেদবুদ্ধিপরায়ণ, প্রতিক্রিয়াশীল ও ব্রিটিশ-সমর্থক প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় ব্রিটিশ-শাসনকে অব্যাহত রাখবারই একটা পরিকল্পনা।

১৯৩৫ সনের শাসনবিধির অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাসমূহ দুভাগে বিভক্ত,—যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক। প্রস্তাবিত "যুক্তরাষ্ট্রে"র মধ্যে একটি নূতন ব্যবস্থার সন্ধান লাভ করা গিয়েছিল; "ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ" এবং "দেশীয় রাজ্যসমূহ"—উভয়কে একত্রিত করে এই সর্বপ্রথম একটি সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া গেল। বলা হয়েছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় দুটি পরিষদ থাকবে; দেশীয় নৃপতিবৃন্দ তাতে যথাক্রমে পাঁচভাগের দুভাগ এবং তিনভাগের একভাগ সদস্য মনোনীত করবেন। নির্বাচিত সদস্য প্রেরণের ব্যাপারে ব্যাপক ভারসাম্যবিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী, যথা মুসলিম, শিখ, তপশীলী, নারী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, শ্রমিক ইত্যাদির জন্যে আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। ঊর্ধতন পরিষদে ২৬০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৭৫টি আসন সাধারণ নির্বাচনের মারফতে ভরাবার ব্যবস্থা হলো, নিম্নতম পরিষদে ৩৭৫টি আসনের মধ্যে মাত্র ৮৬টি। ঊর্ধতন পরিষদের নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাকে ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের মোট জন-সংখ্যার আনুমানিক মাত্র ০·০৫ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হলো; নিম্নতন পরিষদের নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাকে মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ৯ ভাগের ১ ভাগের মধ্যে। এই পরিষদসমূহের ক্ষমতাও ছিল অত্যন্তই সীমাবদ্ধ। দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ভাইসরয়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল; আর্থিক নীতি, আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং পুলিশবিভাগকেও পরিষদসমূহের আওতার বহির্ভূত রাখা হয়েছিল। নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয়ে আইন পাশ করাবার কোনও উপায় ছিলনা। নিজ বিবেচনানুযায়ী প্রয়োগের জন্য ভাইসরয়ের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া ছিল। যে-কোনও আইনকে বাতিল করে দেওয়া, মন্ত্রীদের পদচ্যুত করা, আইন-সভায় অগ্রাহ্য প্রস্তাবকে আইনে পরিণত করা, আইন-সভা ভেঙে দেওয়া এবং শাসনবিধিকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা—ইত্যাদি তার অন্যতম।

শাসনবিধির প্রদেশ-সম্পর্কিত অংশটি—একমাত্র ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের এগারটি প্রদেশ সম্পর্কেই যা প্রযোজ্য—এর চাইতে একটু কম সংকীর্ণ। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের সেখানে সদস্য-মনোনয়নের ব্যবস্থা ছিলনা। আইন-সভার সদস্যরা সেখানে সর্বাংশেই নির্বাচিত; তবে ঊর্ধতন পরিষদের ভোটাধিকার সেখানে নিয়ন্ত্রিত। আলোচনার ব্যাপারেও কোনও বিষয়কেই সেখানে সংরক্ষিত করে রাখা হয়নি। একমাত্র গোয়েন্দা-পুলিশের বিষয়টি ছাড়া। এটি ছিল গবর্ণরের নিয়ন্ত্রণাধীন। তা ছাড়া তাঁর হাতে পূর্ণমাত্রায় জরুরী ক্ষমতা দেওয়া ছিল; "প্রদেশের শান্তি বিপদাপন্ন হয়েছে" বিবেচনা করলে সে ক্ষমতার তিনি প্রয়োগ করতে পারতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জনায়ত্ত সরকার গঠনের ব্যাপারে প্রদেশগুলিতে সীমাবদ্ধ কিছু কিছু সম্ভাবনা ছিল। আইনসভাতেও কেন্দ্রের মত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির জন্যে আসন নির্দিষ্ট করা ছিল, তবে এগারটি প্রদেশের ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে ৬৫৭টিই ছিল "সাধারণ আসন"। এবং এই কারণেই শাসনবিধির বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে ১৯৩৭ সনের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। কংগ্রেস তাতে মোট এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি (পরে আটটি) প্রদেশেই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করে।৮

"The Indian Struggle 1920-34" গ্রন্থের চতুর্দশ পরিচ্ছেদের শেষের দিকে বলা হয়েছিল যে, ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সনে ভারতবর্ষে চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই। সে অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে; ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সনে ভারতবর্ষে চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটেনি। কংগ্রেসের একটা অংশ আইন-সভাসমূহে তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং ধীরে ধীরে তার প্রভাবও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অন্যপক্ষে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল কংগ্রেসের মধ্যে এবং ভারতীয় জনসাধারণের ভিতরে তরুণ-সমাজ ও অধিকতর প্রগতি-পন্থীদের সংগঠন-কার্য গ্রহণ করল। সত্যাগ্রহ অথবা আইন-অমান্য এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের প্রতি জনসাধারণের এসময়ে কোনও আকর্ষণ ছিলনা। ফলতঃ যে শূন্য স্থানের উদয় হয়েছিল, স্বভাবতই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের পক্ষে তাতে কাজ এগিয়ে নেবার সুবিধে হলো। ভারতীয় কমিউনিস্ট দলকে ব্রিটিশ সরকার বে-আইনী ঘোষণা করেছিলেন। এই ক্ষুদ্র দলটি তার সদস্যদের নির্দেশদান করল যে, তারা যেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলে যোগদান করে এবং নিজেদের সংগঠনকার্য ও উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য তারা যেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের প্রকাশ্য জনসংযোগ-ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করে। ছাত্রসমাজ ও কারখানা-শ্রমিকদের একাংশের মধ্যে এই দলটি তাদের প্রভাব বিস্তারে

সমর্থও হয়েছিল। প্রকাশ্যভাবে কাজ চালিয়ে যাবার সহায়তাকল্পে কমিউনিস্ট দল পরে "ন্যাশনাল ফ্রণ্ট" নাম গ্রহণ করে।

রাজনীতিক্ষেত্রে ১৯২০ সন থেকে গান্ধীবাদী নেতৃত্বই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল সেক্ষেত্রে বিকল্প-নেতৃত্ব গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ অর্জন করেছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই দলটির প্রতি তাঁর নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। তিনি যদি প্রকাশ্যভাবে এই দলে যোগদান করতেন ও এর নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন তবে এই বিকল্প-নেতৃত্ব গঠনের কাজ আরও সহজসাধ্য হতো।

১৯৩৫ সনের শরৎকালে আকস্মিকভাবে পণ্ডিত নেহরুকে কারাগার থেকে মুক্তিদান করা হয়। তাঁর স্ত্রী তখন ইউরোপে, মৃত্যুশয্যায়। স্ত্রীর সঙ্গে তিনি যাতে গিয়ে সাক্ষাৎ করতে পারেন তারই জন্যে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ সময় তিনি জার্মাণীর ব্যাডেনউইলারে অতিবাহিত করেন, মাঝে মাঝে তিনি তখন লণ্ডন এবং প্যারিসেও গিয়েছেন। ১৯৩৬ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি ইউরোপে ছিলেন। ঐ সময় লণ্ডন এবং প্যারিসে তিনি যেসব যোগাযোগ করেন, তা তাঁর ভবিষ্যৎ-নীতির উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাশিয়া, আয়াল্যাণ্ড প্রভৃতি যেসমস্ত দেশ তখন ব্রিটিশ-বিরোধী বলে গণ্য হতো সে-সব দেশে তিনি যাননি। এর পূর্বে ইউরোপ-ভ্রমণকালে অবশ্য তিনি মস্কো গিয়েছিলেন। ইটালী, জার্মাণী প্রভৃতি দেশে তিনি কোনও যোগাযোগ করেননি। ফ্যাসিজ্‌ম্‌ এবং ন্যাশনাল সোস্যালিজ্‌ম্‌য়ের প্রতি তাঁর বিরাগই হয়তো তার হেতু; আর নয়তো ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে তাঁর যেসব বন্ধু ছিলেন তাঁদের তিনি ক্ষুণ্ণ করতে চাননি। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি তাঁর "আত্ম-জীবনী" প্রকাশ করেন। ইংরেজ জনসাধারণের উদারনৈতিক অংশের মধ্যে তাতে তিনি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৯৩৬ সনে নেহরু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হয় তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। বৎসরান্তে তিনি পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন, এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ফৈজপুরে অনুষ্ঠিত পরবর্তী বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি-নির্বাচনের ব্যাপারে দু'বারই তিনি কংগ্রেসের গান্ধীপন্থী দলের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিলেন। সভাপতি হিসেবে তিনি গান্ধীপন্থী দল এবং কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের মধ্যবর্তী স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন; দুপক্ষের কোনও পক্ষই তাঁর কার্যকলাপে উদ্বেগ বোধ করেনি, তবে শেষোক্ত পক্ষ খানিকটা পরিমাণে তাঁর নৈতিক সমর্থন লাভ করেছিল।

১৯৩৩ ও ১৯৩৬ সনের মধ্যবর্তী সময়ে রাশিয়ার বাইরে ইউরোপের প্রায় সর্বাংশেই আমি ভ্রমণ করেছি। ভার্সাইয়ের পর ইউরোপের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে ঐ সময় তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বারকয়েক আমি ইটালী ও জার্মাণীতে গিয়েছিলাম। সিনর মুসোলিনীর সঙ্গেও কয়েকবারই আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। নবজাগ্রত যেসব শক্তি পরবর্তীকালে ভার্সাই-চুক্তির পুরাতন-ব্যবস্থাবলীর অবসান ঘটাতে উদ্যত হয়েছিল, একদিকে তার বিকাশ যেমন আমি পর্যবেক্ষণ করেছি, অন্যদিকে সেই পুরাতন-ব্যবস্থার প্রতীক লীগ অব নেশন্‌স্‌কেও আমি পর্যবেক্ষণ করেছি। ভার্সাই-চুক্তির দ্বারা যেসব পরিবর্তন ঘটানো হয়, সেগুলিকে উপলব্ধি করতে আমি সবিশেষ উৎসুক ছিলাম; তদুদ্দেশ্যে আমি অস্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড এবং বল্কান রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিভ্রমণ করতে মনস্থ করি। এই ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের ফলে আমি যে ইউরোপের তৎকালীন অবস্থামাত্র উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম তা নয়, আসন্ন ঘটনাবলীরও খানিকটা আভাষ পেয়েছিলাম। ইউরোপের বহুদেশে আমি ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঔৎসুক্য সঞ্চারে এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠনের সহায়তা করতে সমর্থ হই। আয়ার্ল্যান্ড সফরের পর আমার এই পরিভ্রমণ সমাপ্ত হয়। সেখানে আমি প্রেসিডেন্ট ডি-ভ্যালেরা এবং তাঁর গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। রিপাবলিকান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও সেখানে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম।

লীগ অব নেশন্‌স্‌য়ের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-অর্জনের ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তালাভ সম্ভব কিনা তা স্থির করবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সনে কিছুদিনের জন্য আমি জেনেভায় যাই। ভারতীয় আইন-সভার প্রাক্তন সভাপতি প্রবীণ জাতীয়তাবাদী নেতা শ্রী ভি জে প্যাটেলেরও ছিল সেই একই লক্ষ্য, এবং তিনিও সেই একই উদ্দেশ্যে জেনেভায় এসেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, জেনেভায় এসে পেঁছুবার অব্যবহিত পরেই শ্রীপ্যাটেল* অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং ১৯৩৩ সনের অক্টোবর মাসে সুইজারল্যান্ডের এক স্যানাটোরিয়ামে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম। তা সত্ত্বেও কিছুকালের জন্য আমি জেনেভায় আমার কাজ চালিয়ে যাই। এই সময়ে ভারত-সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কমিটির সঙ্গে আমি একযোগে কাজ করেছি। প্রতিষ্ঠানটির সদরদপ্তর ছিল জেনেভায়। ভারত সম্পর্কে একটি মাসিক বুলেটিন প্রকাশের ব্যাপারে আমি তখন সাহায্য

---

* বিদেশে প্রচারকার্য চালাবার ব্যাপারে অল্প যেকজন ভারতীয় নেতার উৎসাহ ছিল, শ্রীপ্যাটেল তাঁদের অন্যতম। তাঁরই উদ্যোগে ডাবলিনে ভারত-আইরিশ লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

করেছিলাম। ফরাসী, জার্মাণ ও ইংরিজী—তিনটি ভাষায় এই বুলেটিনটি প্রকাশ করা হতো এবং পৃথিবীর সর্বত্র ভারত সম্পর্কে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের কাছে তা পাঠিয়ে দেওয়া হতো। জেনেভায় অবস্থানের শেষের দিকে আমি উপলব্ধি করি যে, লীগ অব নেশন্স্ প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরিভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভারতবর্ষ এই প্রতিষ্ঠানের আদি-সদস্যদের অন্যতম। তা সত্ত্বেও যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-অর্জনের ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগানো যাবেনা তাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। অতঃপর আমি এইমর্মে আন্দোলন আরম্ভ করি যে, লীগের সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থেকে ভারতবর্ষ তার অর্থের অপচয়ই মাত্র করছে; যত শীঘ্র সম্ভব এই প্রতিষ্ঠানের থেকে তার পদত্যাগ করা উচিত। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে এই আন্দোলন ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল।

ইউরোপে অবস্থানকালে ব্রিটিশ সরকারের চররা সর্বত্র আমার উপর নজর রেখেছে এবং আমার অনুসরণ করেছে। বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আমি যাতে যোগাযোগ করতে না পারি তার জন্যেও তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। ফ্যাসিস্ট এবং ফ্যাসিস্টপন্থী দেশগুলিতে ব্রিটিশ চররা আমাকে কমিউনিস্ট প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিল। ওদিকে সমাজ-তান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে তারা আবার আমাকে ফ্যাসিস্ট বলে চালাবার চেষ্টা করেছে। এসব প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও আমি ভারতবর্ষের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রচারকার্য চালাতে সক্ষম হয়েছিলাম। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সমর্থনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তখন আমি সহানুভূতির সঞ্চারেও সমর্থ হয়েছি। এর মধ্যে কয়েকটি দেশে ভারতবর্ষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনকল্পে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়।

কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে যোগদানের জন্য ১৯৩৬ সনের এপ্রিল মাসে আমি বোম্বাই প্রত্যাবর্তন করি। ভিয়েনার ব্রিটিশ কনসালের মারফতে ব্রিটিশ সরকার লিখিতভাবে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। দৃঢ়ভাবে তার জবাব দিয়ে সেই সতর্কবাণী আমি অগ্রাহ্য করি। সরকারকে আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে, যা-খুশী তাঁরা করতে পারেন। ভারতভূমির উপর পদার্পণ করামাত্র বোম্বাইতে আমাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৩৬ সনের শরৎকালে ছ'বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর শ্রী এম এন রায়কে মুক্তিপ্রদান করা হয়। কানপুরের বোলশেভিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে এই দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। পূর্বে ইনি কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালে ছিলেন।

অতীতের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার দরুণ শ্রী এম এন রায় যথেষ্টই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর নামেরও একটা যাদু ছিল। তরুণ দল তাঁর কাছে এসে সমবেত হলো, এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রায়-গ্রুপ নামে নূতন একটি গোষ্ঠী সর্বসাধারণ্যে পরিচিত হয়ে উঠল।

ভারত-সংক্রান্ত যে নূতন শাসনবিধির দ্বারা ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল, ১৯৩৫ সনে তা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। এই শাসনবিধির মারফতে ভারতীয় জনসাধারণ খানিকটা পরিমাণে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করল। নূতন শাসনবিধি অনুযায়ী ১৯৩৬-৩৭ সনের শীতকালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থিরীকৃত হয়। কংগ্রেসের যে অংশ আইন-সভার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন (এ অংশ তখন গান্ধীপন্থী), আসন্ন নির্বাচন-অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনের পর বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য তাঁরা প্রস্তুত হতে আরম্ভ করলেন। গোড়ার দিকে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেছিলেন; ১৯২২-২৩ সনে গোঁড়া গান্ধীপন্থী "নো-চেঞ্জ-পার্টি" যে মনোভাব প্রদর্শন করেছিল, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের এই মনোভাব তাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পরে এ-মনোভাবের খানিকটা পরিবর্তন হলো। তবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তাবকে সমর্থন করলেও মন্ত্রিত্বগ্রহণের তাঁরা তীব্র বিরোধিতা করেন। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের স্পষ্ট কোনও বৈপ্লবিক পটভূমিকা ছিলনা। তার কারণ হয়তো এই যে, এ-দলের সদস্যদের মধ্যে কিছু কিছু ভগ্নস্বপ্ন প্রাক্তন-গান্ধীপন্থী ছিলেন; গান্ধীবাদের প্রভাব থেকে তাঁরা তখনও মুক্ত হননি। আবার নেহরুর ভাবপ্রবণ রাজনীতির প্রভাবে আচ্ছন্ন কিছু কিছু লোকও এ-দলে ছিলেন।

১৯৩৬-৩৭ সনে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের উদ্যোগে এক "মন্ত্রিত্ব-বিরোধী" আন্দোলন আরম্ভ হয়। কংগ্রেসীদের মন্ত্রিত্বগ্রহণের বিরোধিতা করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের সদস্য না হয়েও এ-আন্দোলন যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবের সর্দার শার্দুল সিং কবিশের*, যুক্তপ্রদেশের রফি আমেদ কিদোয়াই†, শ্রীমতী ভি, এল পণ্ডিত‡ এবং শরৎচন্দ্র বসুর§ (লেখকের ভ্রাতা) নাম উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত নেহরু এই আন্দোলনের প্রতি তাঁর নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

---

* কবিশের পরে নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সহ-সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন।
† কিদোয়াই পরে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস-মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী হয়েছিলেন।
‡ শ্রীমতী পণ্ডিতও যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করেন।
§ পরে ইনি বঙ্গীয় আইন-সভায় কংগ্রেস-দলের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন।

জাতীয়তাবাদীরা যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করতে পারে তার জন্যে নূতন শাসনবিধিতে নানারকম প্রতিবন্ধক এবং রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ছিল। তা সত্ত্বেও প্রাদেশিক আইন-সভার নির্বাচনে ব্রিটিশ-ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতেই কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হলো। মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের বিরোধিতা করে এসময়ে প্রবল আন্দোলন চলছিল। তবে কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী (অথবা গান্ধীপন্থী) নেতারা এ-ব্যাপারে যে সুকৌশল ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তারই ফলে ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে তাঁরা এ-আন্দোলনকে বানচাল করে দিতে ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে দিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্বগ্রহণের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত করিয়ে নিতে সমর্থ হন।

কলকাতার একটি হাসপাতালে আমাকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। আইন-সভার নির্বাচন শেষ হবার পর ১৯৩৭ সনের মার্চ মাসে আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরবর্তী কয়েক মাসে বাংলা ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া অন্যান্য স্থানের রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকাংশই ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করেন। বাংলা দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা তখন কয়েক সহস্র হবে। এঁদের অধিকাংশকেই বিনা-বিচারে কারাবন্দী অথবা অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। বঙ্গোপসাগরের অপরাধী-উপনিবেশ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েকশত রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। এঁদের অধিকাংশেরই বাসভূমি হলো বাংলা, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশ। ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে কংগ্রেস দল এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে এবং এই সমস্ত প্রদেশে প্রকৃতপক্ষে সকল রাজনৈতিক বন্দীকেই মুক্তিদান করা হয়। এর অল্পকাল পরেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তিলাভের দাবীতে অনশন-ধর্মঘট শুরু করেন। অতঃপর তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল তা হলো সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ও উড়িষ্যা। আসামের প্রথম মন্ত্রিসভার পতন ঘটবার পর ১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সেখানেও কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সিন্ধুতেও* কংগ্রেস-সমর্থিত মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, তবে কংগ্রেস তাতে অংশগ্রহণ

---

* ভারতে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে সিন্ধুর কংগ্রেসপন্থী প্রধানমন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্স্ ১৯৪২ সনের অক্টোবর মাসে পদত্যাগ করেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তিনি "খান-বাহাদুর" খেতাব পেয়েছিলেন; এই খেতাবও তিনি বর্জন করেন।

করেনি। ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে* ন্তন একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়; কংগ্রেস তাতে অংশগ্রহণ করেছে। একমাত্র পাঞ্জাবে স্যর সিকান্দার হায়াৎ খানের মন্ত্রিসভার সঙ্গে বরাবর কংগ্রেসের একটা বিরোধ ছিল।

কংগ্রেস দল সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিত্বগ্রহণের পর সেখানকার শাসনব্যবস্থার মধ্যে স্পষ্টতই একটা জাতীয়তাবাদী চরিত্র ফ্রটে উঠল; কংগ্রেসের মর্যাদাও তাতে বহ্রগ্রণে ব্ৃদ্ধিলাভ করল। জনসাধারণের মধ্যে তখন এই ধারণারই সঞ্চার হয়েছিল যে, অদ্র ভবিষ্যতে কংগ্রেসই শ্রেষ্ঠ-শক্তি বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু সেকথা ছেড়ে দিলে অন্যকোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তখন ঘটেনি। ক্ষমতাভারও তখন প্রাদেশিক গবর্ণর এবং ভারতীয় সিবিল সার্বিসের স্থায়ী আমলাদের হাতেই ন্যস্ত। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ব্রিটিশ; কংগ্রেস দলের পক্ষেও তাই শাসনব্যবস্থার কোনও স্দ্রপ্রসারী পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব ছিল না। কিছ্রদিন বাদে লক্ষ্য করা গেল যে, কংগ্রেস-কর্মীদের একটা বিরাট অংশের মধ্যে আইনসভাস্লভ অথবা নিয়মতান্ত্রিক মনোভাবের স্ৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁদের বৈপ্লবিক চেতনাও স্তিমিত হয়ে আসছে।

১৯৩৪ সনে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের অভ্যুদয়ে নিশ্চতর্পে ব্রঝতে পারা গেল যে, দেশের বামপন্থী শক্তিগ্রলি আবার জেগে উঠছে। কৃষক ও ছাত্রসমাজ এবং কিছ্রপরিমাণে শ্রমিকদের মধ্যেও এই সময় এক অভূতপ্র্ব জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। এই সর্বপ্রথম নিখিল ভারত কিষাণ সভা নামে স্রসংগঠিত একটি সর্বভারতীয় কৃষক সংস্থার স্ৃষ্টি হলো। এর বিশিষ্টতম নেতা ছিলেন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী। ছাত্র-আন্দোলন অতীতে বহ্র পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে; নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনেরা† নেতৃত্বে সেই আন্দোলনকেও এবারে কেন্দ্রীভূত করা হলো। ১৯২৯ সনে নাগপ্ররে এবং ১৯৩১ সনে কলকাতায়—উপর্য্রপরি এই দ্র'বার নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ স্ৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটিকেও এবারে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী—সর্বমতের প্রতিনিধিত্বম্লক একটি য্রক্ত

* জানা গেল যে, মন্ত্রিসভার যে-কজন সদস্য কংগ্রেসদলভুক্ত, প্রদেশের ব্রিটিশ গবর্ণর কয়েক মাস প্র্বে এই অভিযোগে বিধিবহির্ভূতভাবে তাঁদের পদচ্যুত করেছেন যে, গোপনে গোপনে তাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সংশিলষ্ট ছিলেন।

† ১৯৪০ সনের ডিসেম্বর মাসে নাগপ্ররে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের মধ্যে ভেদস্ৃষ্টি হয়। ফেডারেশনের কমিউনিস্ট-গোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। ছাত্রসমাজের প্রধান অংশ এখন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজনৈতিক নেতৃত্ব অন্রসরণ করছে।

নেতৃত্বাধীনে ঐক্যবদ্ধ করা হলো। সাহিত্যক্ষেত্রেও এই সময়ে প্রগতিশীল লেখকদের সংগঠিত করবার একটা চেষ্টা হয়।

পণ্ডিত নেহরু যে দু'বারের জন্য সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়ে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন মহলে বেশ খানিকটা উৎসাহ এবং কর্মোদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়; কংগ্রেসের প্রগতিপন্থী অংশের মধ্যেও তখন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। তাঁরই নির্দেশক্রমে কিছুসংখ্যক সোস্যালিস্টকে তখন কংগ্রেসের কয়েকটি স্থায়ীপদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে আরও ঢের বেশী কিছু করা সম্ভব ছিল। ১৯৩৬-৩৭ সনে তাঁর জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেছিল। একদিক থেকে কংগ্রেসের মধ্যে তিনি তখন মহাত্মা গান্ধীর অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী। তার কারণ তাঁর পিছনে তখন বামপন্থীদের সর্বাংশেরই সমর্থন বর্তমান; গান্ধীজী সে-সমর্থন লাভ করেননি। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগতভাবে মহাত্মা খুবই শক্তিশালী ছিলেন। তার কারণ কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে তিনি নিজস্ব একটি দল গড়ে তুলেছিলেন। এবং এই গান্ধীপন্থী দলটির সহায়তায় কংগ্রেসকে তিনি তাঁর পরিচালনাধীনে রাখতে পারতেন। অন্যদিকে নেহরুর যতই না কেন জনপ্রিয়তা থাকুক, নিজস্ব কোনও দল তাঁর ছিলনা। ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করতে হলে দুটিই মাত্র পথ তাঁর সামনে তখন উন্মুক্ত ছিল। এক, গান্ধীবাদের নীতিসমূহকে মেনে নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ গান্ধীপন্থী দলটিতে যোগদান করা, আর নয়তো গান্ধীপন্থী দলটির বিরুদ্ধে নিজস্ব দল গঠন করা। প্রথমটি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি; তার কারণ ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মার প্রতি তাঁর আনুগত্য থাকলেও গান্ধীবাদের নীতিসমূহকে তিনি মেনে নেননি। অন্যদিকে আবার নিজস্ব কোনও দলও তিনি গঠন করলেন না। তার কারণ গান্ধীপন্থীরা তাতে ক্ষুণ্ণ হতেন। মহাত্মার বিরুদ্ধে কোনও কিছু করবার মতো সাহস নেহরুর জীবনে কখনও হয়নি। ফলতঃ গান্ধীপন্থী দল কিংবা প্রগতিপন্থী দলগুলির কোনওটিতে যোগ না দিয়ে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী দু'দলকেই তিনি খুশী রাখবার চেষ্টা করে চলতে লাগলেন। পরিণামে কংগ্রেস দলের মধ্যে তাঁকে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে হয়েছে। আজ ১৯৪২ সনের এই ডিসেম্বর মাসেও তাঁর সেই অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। ১৯৩৭ সনের পর তিনি গান্ধীজীর আরও কাছে ঘেঁষে এসেছেন। ১৯৩৯ সনে তিনি গান্ধীপন্থী দলটিতে প্রায় যোগও দিয়েছিলেন বলা চলে। মহাত্মা সেজন্যে তাঁকে পুরস্কৃতও করেছেন। ১৯৪২ সনের জানুয়ারী মাসে মহাত্মা ঘোষণা করেন যে, নেহরুকে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করছেন। গান্ধীজীর

প্রতি অবিচলিত আনুগত্য থাকলে নেহরুর সেই অবস্থার আর কোনও পরিবর্তন ঘটতনা। কিন্তু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌য়ের ভারত-সফর নিয়ে এবং ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কের সমস্যা সম্বন্ধে নেহরু যে আপোষ ও সহযোগ-নীতির প্রস্তাব করেন, মহাত্মা ও তাঁর দল কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এই মতানৈক্যের দরুণ বস্তুতই নেহরু আজ নিঃসঙ্গ এবং এ-ব্যাপারের পর এইটেই সম্ভব যে, গান্ধীপন্থীরা সহজে মহাত্মার পরবর্তী নেতা হিসাবে নেহরুকে মেনে নেবেন না।

অস্ট্রীয়ার বাডগ্যাসটীন স্বাস্থ্য-নিবাসটি আমার বড় প্রিয় জায়গা; ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসে আর-একবার সেখানে আমি গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমি ইংল্যাণ্ডে যাই। ইংল্যাণ্ডে থাকতে ১৯৩৮ সনের জানুয়ারী মাসে আমি খবর পাই যে, সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে কংগ্রেসের সভাপতিপদে নির্বাচিত করা হয়েছে। সেবারকার ইংল্যাণ্ড-সফরকালে আমি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য যথা লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ও লর্ড জেটল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন শ্রমিক ও উদারনৈতিক দলীয় কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এঁদের মধ্যে মিঃ অ্যাটলী, মিঃ আর্থার গ্রীণউড, মিঃ বেভিন, স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌, মিঃ হ্যারল্ড ল্যাস্কি, লর্ড অ্যালেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটেনের সঙ্গে যাতে কোনও আপোষরফা করা না হয় তদুদ্দেশ্যে কংগ্রেস-সভাপতি হিসেবে কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ-বিরোধিতার নীতিকে দৃঢ় করে তুলবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। গান্ধীপন্থী মহলে তাতে করে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। এঁরা তখন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। পরে, ১৯৩৮ সনে, শিল্প-প্রসার ও জাতীয় উন্নয়নের একটা সর্বাত্মক পরিকল্পনা রচনার জন্য আমি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির প্রতিষ্ঠা করি। মহাত্মা গান্ধী এতে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। শিল্প-প্রসারের তিনি বিরোধী ছিলেন। ১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক চুক্তি সম্পন্ন হবার পর ভারতীয় জনসাধারণকে জাতীয় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তুলবার উদ্দেশ্যে সারা ভারতবর্ষে আমি প্রকাশ্য-ভাবেই প্রাচরকার্য শুরু করলাম। ইউরোপে তখন যুদ্ধ আসন্ন; ভারতবর্ষের সংগ্রামও একই সঙ্গে আরম্ভ করতে হবে। এ-প্রস্তাব জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করলেও গান্ধীপন্থীরা এতে অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। মন্ত্রিত্ব এবং আইনসভার কার্যে কোনও বিঘ্ন ঘটুক, এ তাঁরা চাননি। এ-সময়ে কোনও জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করার তাঁরা বিরোধী ছিলেন।

জনসাধারণ বুঝতে না পারলেও গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে আমার বিরোধ তখন ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলতঃ ১৯৩৯ সনের জানুয়ারী মাসে সভাপতি-নির্বাচনের সময় গান্ধীপন্থীরা আমার তীব্র বিরোধিতা করেন। পণ্ডিত নেহরুও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যাধিক্যে আমি জয়লাভ করি। ১৯২৩-২৪ সনের পর মহাত্মার প্রকাশ্য-পরাজয় এই সর্বপ্রথম। তাঁর সাপ্তাহিক পত্র হরিজনে সে-পরাজয়ের কথা তিনি স্বীকারও করলেন। গান্ধীজী এবং নেহরুর সঙ্গে প্রকাশ্য-বিরোধিতা সত্ত্বেও সারা দেশে আমার অনুগামীদের সংখ্যা কত বিপুল এবং তার প্রভাব কতখানি, এই নির্বাচনের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হলো।

১৯৩৯ সনের মার্চ মাসে আমার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আমি প্রস্তাব করি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে অবিলম্বে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এইমর্মে দাবী জানিয়ে একটি চরম-পত্র প্রেরণ করা উচিত যে, ছ'মাসের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে; একই সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামের জন্যও কংগ্রেসকে প্রস্তুত হতে হবে। গান্ধীপন্থী দল এবং নেহরু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়ে যায়। ফলতঃ অদ্ভুত এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের আমি সভাপতি, অথচ সে-প্রতিষ্ঠান আমার নির্দেশ গ্রহণ করছে না। আরও দেখা গেল যে, সভাপতির পক্ষে যাতে কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে, গান্ধীপন্থী দল তার জন্য প্রতিক্ষেত্রেই সভাপতির বিরোধিতা করছেন। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে এক সম্পূর্ণ অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো। এ-অচলাবস্থার অবসান ঘটাবার দুটি মাত্র পথ ছিল; হয় গান্ধীপন্থী দলকে তাঁদের বাধাসৃষ্টির নীতি পরিত্যাগ করতে হবে, আর নয়তো গান্ধীপন্থী দলের কাছে কংগ্রেস-সভাপতিকে নতিস্বীকার করতে হবে। এর একটা মীমাংসার উপায় খুঁজে বার করবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সরাসরিভাবে আমার আলোচনা হয়; কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুসারে পরবর্তী বৎসরের জন্য সভাপতি একটি কার্যকরী পরিষদ (ওয়ার্কিং কমিটি) গঠনের অধিকারী; কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল যে. গান্ধীপন্থী দলের পছন্দ অনুযায়ী যদি কার্যকরী পরিষদ গঠিত না হয় তাহলে তাঁরা আগের মতই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে চলবেন। কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীপন্থী দলের তখন এতই প্রতিপত্তি যে, তাঁরা যদি প্রতি-বন্ধক সৃষ্টি করতেই বদ্ধপরিকর হন তাহলে সভাপতির পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

গান্ধীপন্থী দলের মনোভাবে বোঝা গেল যে, আমার নির্দেশ তাঁরা মেনে

চলবে না, আবার কংগ্রেসের পরিচালন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেও আমাকে দেবেন না। আমি যদি নামেমাত্র সভাপতি থাকতে রাজী হই, একমাত্র তাহলেই তাঁরা আমাকে বরদাস্ত করবেন। গান্ধীপন্থীদের এই একটা সুবিধা ছিল যে, কংগ্রেসের মধ্যে তাঁরাই তখন একমাত্র সংগঠিত দল; সুসংহত নেতৃত্বাধীনে তাঁরা তখন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ বামপন্থী অথবা প্রগতি-বাদী ব্যক্তিদের উদ্যোগেই ১৯৩৯ সনের জানুয়ারী মাসে আমি সভাপতিপদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলাম। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এঁদের একটা অসুবিধে ছিল। তা হলো এই যে, গান্ধীপন্থী দলের মত বিশেষ একজনের নেতৃত্বাধীনে এঁরা তখন সঙ্ঘবদ্ধ নন। বামপন্থীদের সকলেরই সমান আস্থাভাজন কোনও দল অথবা গোষ্ঠীর তখনও সৃষ্টি হয়নি। বামপন্থীদের মধ্যে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলই তখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দল বটে, তবে তাদের প্রভাবও ছিল সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে আমার বিরোধ সুরু হবার পর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলও দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব দেখাতে লাগল। বামপন্থীরা সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল না থাকায় গান্ধীপন্থী দলের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩৯ সনে কংগ্রেসের মধ্যে একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল বামপন্থী দলের অস্তিত্ব ভারতবর্ষের প্রাথমিক রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে পারত।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার আলোচনার ফলে প্রকাশ পায় যে, গান্ধী-পন্থীরা আমার নির্দেশ মেনে চলবেন না। অন্যদিকে আমিও নামেমাত্র সভাপতি থাকতে রাজী হইনি। ফলতঃ সভাপতির পদে ইস্তফা দেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না। ১৯৩৯ সনের ২৯শে এপ্রিল তারিখে আমি পদত্যাগ করলাম। তার অব্যবহিত পরেই সমস্ত বামপন্থীদের একই পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ করবার জন্য কংগ্রেসের মধ্যে আমি একটি প্রগতিবাদী দল গঠন করতে এগিয়ে আসি। এই দলের নাম দেওয়া হয় ফরওয়ার্ড ব্লক। আমি এর প্রথম সভাপতি; সহসভাপতি হন পাঞ্জাবের সর্দার শার্দুল সিং কবিশের (বর্তমানে অস্থায়ী সভাপতি)।

১৯৩৯ সনের বহুপূর্বেই আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক সংকট আসন্ন; সে সংকট মহাযুদ্ধের আকারে দেখা দেবে এবং স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য ভারতবর্ষকে সেই সংকটের পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। মিউনিক চুক্তির পর থেকে অর্থাৎ ১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে আমি এই কথাটাই বুঝিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা করে এসেছি। কংগ্রেসকেও আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে,

বহির্বিশ্বের ঘটনাস্রোতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তাকে আপন নীতি নির্ধারণ করতে হবে। এ-কাজে গান্ধীপন্থী দল প্রতি পদক্ষেপেই আমাকে বাধাপ্রদান করেছেন। তার কারণ আসন্ন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের কোনও ধারণাই ছিল না। জাতীয় সংগ্রামে অবতীর্ণ না হয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে একটা আপোষরফা করতেই তাঁরা তখন উৎসুক। তা সত্ত্বেও আমি জানতাম যে, কংগ্রেস ও জনসাধারণের মধ্যে আমার বহুসংখ্যক সমর্থক বর্তমান। একমাত্র প্রয়োজন একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল দলের।

দু'টি আশায় আমি ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠন করেছিলাম। প্রথমতঃ, ভবিষ্যতে যদি আবার গান্ধীপন্থী দলের সঙ্গে আমার বিরোধ উপস্থিত হয় তো অধিকতর কার্যকরীভাবে আমি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারব। শুধু তাই নয়, সমগ্র কংগ্রেস একদিন আমার মত গ্রহণ করবে, এরকম আশাও তখন করা গেল। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসকে যদি আমি আমার মতামত গ্রহণ করাতে না পারি তো তাতেও কোনও ক্ষতি নেই; বড় রকমের কোনও সংকট সৃষ্টি হলে গান্ধীপন্থী দল যদি তখন অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে না-ও পারে তো নিজ বিবেচনানুযায়ী আমার পক্ষে তখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলম্বন সম্ভব হবে। পরবর্তীকালে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠাতার এই আশা তাতে বহুলাংশেই পূরণ হয়েছিল।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীপন্থীদের সমস্ত ক্রোধ তার উপরে গিয়ে পড়ল। ১৯২৫ সনে দেশবন্ধু সি, আর, দাসের মৃত্যুর পর গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি এই সর্বপ্রথম একটা মারাত্মকরকমের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হলো। গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামীরা এটা সহ্য করতে পারেননি। একদিকে গান্ধীপন্থীদের ভ্রূকুটি, অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারও ফরওয়ার্ড ব্লকের উপরে দমন এবং নিগ্রহ-নীতি চালিয়ে যেতে লাগলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে গান্ধীপন্থীদের অপেক্ষা ফরওয়ার্ড ব্লক ঢের বেশী বিপজ্জনক ছিল।

ফরওয়ার্ড ব্লক জন্মলাভ করবার ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিরোধ আরও তীব্র হয়ে উঠল। কারুর পক্ষেই তখন আর কোনও না কোনও দিকে যোগদান না করে উপায় ছিল না। এই অভ্যন্তরীণ সংকটের ফলে পণ্ডিত নেহরুই সব চাইতে বেশী অসুবিধায় পড়েন। এ যাবৎ তিনি বেশ কৌশল ও নৈপুণ্য-সহকারে দু'নৌকোয় পা দিয়ে এসেছেন। তার ফলে বামপন্থীদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হয়েও তাঁর পক্ষে গান্ধীপন্থী দলের সমর্থন লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। ফরওয়ার্ড ব্লকের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে তাঁকে পথ বেছে নিতে

হলো। ধীরে ধীরে তিনি দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদী দলের দিকে সরে যেতে লাগলেন। গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পর্ক যতই তিক্ত হয়ে উঠেছে, ততই তিনি মহাত্মাকে সমর্থন করতে এগিয়ে গিয়েছেন।

গান্ধীপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত সমগ্র কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফরওয়ার্ড ব্লকের নীতি গৃহীত হলে ভারতবর্ষ তাতে সর্বাধিক উপকৃত হতো। অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ফলে উৎসাহ ও সময়ের যে অপচয় হয়েছে, সে অপচয় তাহলে হতো না এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংগ্রামের ব্যাপারে কংগ্রেসের শক্তিও তাহলে বৃদ্ধি পেত। কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতি নিজ নিয়মানুসারেই কাজ করে যায়। ১৯৩৮ সন থেকে মহাত্মা গান্ধী এই কথাই বলে এসেছেন যে, আসন্ন ভবিষ্যতে জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করবার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না; অপরপক্ষে আমার মত অন্যান্যরা—তাঁর চাইতে এঁরা কম দেশপ্রেমিক নন—দৃঢ়নিশ্চিত ছিলেন যে, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশ তখন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত, এতখানি প্রস্তুত সে আর আগে কখনও ছিল না। সেইসঙ্গে তাঁরা আরও বিশ্বাস করতেন যে, আসন্ন আন্তর্জাতিক সংকট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা অর্জনের একটা সুযোগ এনে দেবে। মানবেতিহাসে এরকম সুযোগ বড় একটা আসে না। গান্ধীজীকে একথা বোঝাবার অন্যান্য চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, ফরওয়ার্ড ব্লককে সংগঠিত করে জনমত জয় করতে এগিয়ে যাওয়া এবং এইভাবে মহাত্মার উপরে পরোক্ষ চাপ দেওয়া ছাড়া তখন আর অন্য কোনও উপায় ছিল না। এই উপায়ই শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হলো। বস্তুত এ যদি না করা হতো তো গান্ধীজী তাঁর আগেকার মনোভাবের পরিবর্তন করতেন না এবং ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে তিনি যেখানে ছিলেন, সেইখানেই থেকে যেতেন।

১৯৩৯ সনের এপ্রিল মাসে কলকাতায় নেহরুর সঙ্গে আমার যে দীর্ঘ আলোচনা হয় এখনও তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঐ সময় আমি কংগ্রেস-সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে নূতন একটি দল গঠনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম। নেহরু বললেন যে, তাতে করে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হবে এবং সঙ্কটের মুহূর্তে জাতীয় প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়বে। পালটা যুক্তি দেখিয়ে আমি বললাম, এক ধরণের ঐক্যের ফলে অধিকতর কার্যকরী ব্যবস্থাবলম্বন সম্ভব হয় এবং আর-এক ধরণের ঐক্যের ফলে কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গান্ধীপন্থী দলের কাছে আত্মসমর্পণ করলে কংগ্রেসের মধ্যে একটা বাহ্যিক ঐক্য বজায় রাখা যাবে বটে,—কিন্তু গান্ধীপন্থী দল জাতীয়সংগ্রাম ব্যবস্থার বিরোধী; সুতরাং ঐক্য বজায় থাকলেও সে-ঐক্য ভবিষ্যতে কংগ্রেসের সমস্ত বলিষ্ঠ কর্মোদ্যোগকেই পঙ্গু করে দেবে। পক্ষান্তরে

কংগ্রেসের মধ্যে যদি বলিষ্ঠ কর্মনীতিসম্পন্ন একটি দল সংগঠন করা হয় তো তা একদিন গান্ধীপন্থী দল এবং সমগ্র কংগ্রেসকেই সাংগ্রামিক চেতনাসম্পন্ন কার্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তা ছাড়া, সামনে আরও সংকটকাল পড়ে রয়েছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধা অনিবার্য। সেই আন্তর্জাতিক সংকটের মধ্যে যদি কাজ করতে হয় তো সুযোগের সদ্ব্যবহারে প্রস্তুত একটি দল থাকা দরকার। গান্ধীবাদী দল যদি সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে অনিচ্ছুক হন তো সময় থাকতে থাকতেই অবিলম্বে আর-একটি দল গঠন করা কর্তব্য। এখন যদি এ-কাজ অবহেলা করা হয় কিংবা মুলতুবী রাখা হয় তবে পরে, ভারতবর্ষ সেই আন্তর্জাতিক সংকটের কবলিত হলে, আর এ-কাজ করা সম্ভব হবে না। স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে আসন্ন আন্তর্জাতিক সংকটের সুযোগ গ্রহণে প্রস্তুত সুসংগঠিত কোনও দল না থাকলে ভারতবর্ষ তার ১৯১৪ সনের ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করবে।

এ-আলোচনায় অবশ্য কোনও ফল হয়নি, নেহরু সেই আগের মতই গান্ধী-পন্থী দলটিকে সমর্থন করে চলতে লাগলেন। কিন্তু যতই তিনি তা করতে লাগলেন, ততই তিনি বামপন্থীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগলেন।

১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলাম যে, আন্তর্জাতিক সংকটের সৃষ্টি হলে ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণের যে সুযোগ উপস্থিত হবে, গান্ধীজী তার সদ্ব্যবহার করবেন না। আরও বুঝলাম যে নিকট ভবিষ্যতে ব্রিটেনের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন না। (ভারতীয় পরিস্থিতির এই বিচার বাস্তবানুগ নয়; গান্ধীজীর বার্ধক্যই হয়তো তার কারণ।) ১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক সংকটের সময় আমি কংগ্রেসের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। ঐ সময়ে সত্যিসত্যিই ইউরোপে যদি যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য তা স্থির করবার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে সমস্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, স্বভাবতঃই আমাকেই তাতে সভাপতিত্ব করতে হয়। এক বৎসর পর ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সত্যিই যখন যুদ্ধারম্ভ হলো তখন যেসমস্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, এই বৈঠকগুলিকে তার মহড়া বলতে পারা যায়। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মনোভাব তখন স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল।

১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে-কোনও কারণেই হোক, মহাত্মা গান্ধী তাঁর চলিষ্ণুতা এবং কর্মোদ্যোগ

হারিয়েছেন; ভারতবর্ষে তখন বিকল্প-নেতৃত্ব গঠনের নিম্নোক্ত সম্ভাবনাগুলি বিদ্যমান ছিল।

(১) পণ্ডিত নেহরুর মাধ্যমে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পণ্ডিত নেহরু জেনেশুনেই এই সুযোগের অবহেলা করেছিলেন। তাঁর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং বৈপ্লবিক মানসিক-গঠনের অভাবই প্রধানতঃ তার জন্য দায়ী।

(২) এম. এন. রায়ের মাধ্যমে।

এম. এন. রায় সত্যিই একটি দল গঠন করেছিলেন, এবং বিকল্প-নেতৃত্বের কথাও তিনি বলতেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের মধ্যেই কোনও ত্রুটি ছিল, এবং তারই জন্যে, অল্পকালের মধ্যেই বন্ধুর চাইতে তাঁর শত্রুর সংখ্যাই বেশী হয়ে দাঁড়াল। তবে তখনও তাঁর ভবিষ্যৎ ছিল। কিন্তু বর্তমান মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বিনাশর্তে সহযোগিতার জন্য তিনি প্রকাশ্যে ওকালতি করতে শুরু করলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এইটেই তাঁর পতন ঘটাল।

(৩) কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের মাধ্যমে।

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সনের মধ্যে এই দলটিই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় দল হয়ে উঠবার শ্রেষ্ঠ সুযোগ লাভ করেছিল। সে সুযোগের এ-দল সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। "The Indian Struggle 1920-34" গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমি এইরূপ অনুমানই ব্যক্ত করেছিলাম। প্রথম থেকেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের মধ্যে বৈপ্লবিক চরিত্রের অভাব ছিল। বরং বলা চলে যে, বৈপ্লবিক আন্দোলনের পুরোবর্তী না হয়ে এই দল বরং কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের ভিতরে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসের পর গান্ধীজী এবং নেহরু এঁদের স্বমতে টেনে নেন। এবং তাতে করেই এই দলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায়।

(৪) কমিউনিস্ট দলের মাধ্যমে।

কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল যখন অবস্থানুযায়ী নীতি-নির্ধারণে ব্যর্থ হলো, কমিউনিস্ট দল তখন সামনে এগিয়ে আসবার একটা সুযোগ লাভ করেছিল। এই দল তখন "ন্যাশনাল ফ্রন্ট" নামে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কমিউনিস্ট দলের তখন একে তো লোকবল কম, তার উপরে আবার তাদের জাতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীরও অভাব ছিল। এই কারণেই তারা জাতীয়-সংগ্রামের ধারক হয়ে উঠতে

পারেনি। স্বাজাত্যবোধের অভাবের দরুণ এই দল প্রায়শঃই অবস্থা এবং সংকটবিচারে ভুল করেছে; এবং পরিণামে তারা যে নীতি গ্রহণ করেছে তা ভ্রান্ত।

কংগ্রেসের সমস্ত প্রগতিপন্থীদের একত্রিত করবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল যাতে তাদের প্রতিষ্ঠানকে আরও সুপরিসর করে তোলে এবং একটি বামপন্থী ব্লক গঠন করে, ১৯৩৮ সনের সারাটা বছর তার জন্য বারংবার তাদের আমি সেই পরামর্শই দিয়ে এসেছি। কিন্তু তা এদল করেনি। সমাজ-তন্ত্রী দলের ভুলটা আর কিছুই নয়, সারাক্ষণ তারা শুধু সমাজতন্ত্রের কথাই বলত। কিন্তু শত হলেও তা ভবিষ্যতের ব্যাপার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষবিহীন সংগ্রাম, এবং সংগ্রামের ব্যাপারে মহাত্মা-উদ্ভাবিত পন্থা অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী পন্থাগ্রহণই তখন ভারতবর্ষের আশু প্রয়োজন। অহিংস পন্থানুসারী বলেই গান্ধীবাদ সে-প্রয়োজন মেটাতে পারেনি; ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য গান্ধীবাদ তখন ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষের কথা চিন্তা করছে। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-অর্জনের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংকটের গুরুত্বও সে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারেনি। এই সমস্ত ত্রুটির সংশোধন করে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা এনে দিতে পারে, এমন একটি দলেরই তখন প্রয়োজন ছিল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপোষবিহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের আশু উদ্দেশ্য। তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন; গান্ধীবাদী অহিংসার ন্যায় কোনও দার্শনিক মনোভাব অথবা নেহরুর চক্রশক্তি-বিরোধী পররাষ্ট্র-নীতির মত কোনও ভাবপ্রবণতা যেন ভারতবাসী জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করতে না পারে। বাস্তববুদ্ধিসম্মত পররাষ্ট্র-নীতি এবং যুদ্ধোত্তরকালে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে ভারত গঠনই ছিল ব্লকের আদর্শ।

ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যেই ফরওয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি। এই কারণেই প্রথমাবধিই এই প্রতিষ্ঠান জনচিত্তে এক প্রচণ্ড আলোড়ন জাগিয়ে তুলতে পেরেছে। এই কারণেই উত্তরোত্তর এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বস্তুতঃ কয়েক মাস পরে মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন যে, কংগ্রেস-সভাপতির পদে ইস্তফা দেবার পর আমার জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

আগে যারা অবিশ্বাসী ছিল, ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ বাধবার পর তারাই বলেছে যে, ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারকে ছ'মাসের চরমপত্র দিতে বলে' আমি রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলাম। ব্লকের জনপ্রিয়তা এতে করে আরও বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪২ সনের অগাস্ট

১৯৩৯ সনের মে মাস থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের জোর প্রচারকার্য চলতে থাকে। সেই বছরেরই জুলাই মাসে এই কার্যকলাপে বিঘ্নসৃষ্টি করে গান্ধী-পন্থী দল তার উত্তর দিলেন। কোনো না কোনো অছিলায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক ব্লকের কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে "শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা" অবলম্বন করা হয়। কিন্তু তাতে করে ব্লক-সদস্যদের মনোবল আরও দৃঢ় হয়ে উঠল, দেশবাসীর মধ্যে তাঁদের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পেল।

১৯৩৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে মাদ্রাজের সমুদ্রতীরে এক বিরাট জনসভায় আমি বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। সভায় প্রায় দু'লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল; যতগুলি সভায় এযাবৎ আমি বক্তৃতা দিয়েছি এইটিই তার মধ্যে বৃহত্তম। আমি যখন বক্তৃতা দিচ্ছি সেইসময় শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য থেকে একজন এসে আমার হাতে একখানি সান্ধ্য পত্রিকা তুলে দিলেন। কাগজখানির উপরে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম যে, জার্মাণীর বিরুদ্ধে ব্রিটেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তৎক্ষণাৎ আমি যুদ্ধের প্রসঙ্গে চলে এলাম। বহুপ্রত্যাশিত সেই সংকট শেষ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষের পক্ষে এ এক সুবর্ণ-সুযোগ।

ব্রিটেন যেদিন জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সেইদিনই ভাইসরয় ভারতবর্ষকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করলেন। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য তাতে কঠোরতম ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি ঘোষণা করলেন যে, ১৯৩৫ সনের আইনানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিধি প্রতিষ্ঠার কাজ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রইল।

৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর মহাত্মা গান্ধী সংবাদপত্রে এক বিবৃতিপ্রদান করেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে মতানৈক্য সত্ত্বেও ব্রিটেনের এই সংকটকালে তার সঙ্গে সহযোগিতা করাই ভারতবর্ষের কর্তব্য। ভারতীয় জনসাধারণ এই বিবৃতিতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার কারণ ১৯২৭ সন থেকে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ তাদের এইকথাই শিখিয়ে

এসেছিলেন যে, পরবর্তী মহাযুদ্ধকে যেন তারা স্বাধীনতা অর্জনের একটি অপূর্ব সুযোগ বলেই গণ্য করে। গান্ধীজীর এই বিবৃতির পর গান্ধীপন্থী দলের বহু নেতা এইমর্মে প্রকাশ্য-ঘোষণা করতে লাগলেন যে, ভারতবর্ষের জন্য তাঁরা স্বাধীনতা দাবী করছেন বটে, তবে ব্রিটেনের জয়ই তাঁদের কাম্য। ভারতীয় জনমতের উপরে এই ধরণের প্রচারকার্যের খুবই অশুভ প্রতিক্রিয়া ঘটবার সম্ভাবনা ছিল; এই কারণেই ফরওয়ার্ড ব্লক—ততদিনে এই দলটি একটি সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে—ব্যাপকভাবে পাল্টা-প্রচারকার্য শুরু করল। গান্ধীবাদী দলের কথার প্রত্যুত্তরে ফরওয়ার্ড ব্লক বলতে লাগল, ব্রিটেনের যুদ্ধে যে ভারতবর্ষের সহযোগিতা করা উচিত নয়—১৯২৭ সন থেকে এই কথাই কংগ্রেস বারংবার ঘোষণা করে এসেছে; কংগ্রেসকে এখন সেই নীতি অনুযায়ীই কাজ করতে হবে। শুধু তাই নয়, ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যবৃন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, এ-যুদ্ধে ব্রিটেনের জয়লাভ তাঁদের কাম্য নয়; তার কারণ একমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরাজয় ও ধ্বংসের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভের আশা করতে পারে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের এই প্রচারকার্য চলতে লাগল। আমিও সারাদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলাম। ঐ সময়ে দশ মাসের মধ্যে প্রায় হাজারখানেক সভায় আমি বক্তৃতা দিয়েছি। ব্রিটিশ সরকার যে এইরকম ব্রিটিশ-বিরোধী ও যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারকার্য চলতে দিলেন অনেকেই তখন তাতে বিস্ময়বোধ করেছিলেন। আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম। আসলে ব্রিটিশ সরকার তখন এই ভেবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে, ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে যদি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, ব্লক তাহলে কংগ্রেস ও জনসাধারণকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করতে উদ্বুদ্ধ করবে। ব্রিটিশ সরকারের এই মানসিক দৌর্বল্যের জন্যই ফরওয়ার্ড ব্লক তখন তার ব্রিটিশ-বিরোধী ও যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তবে ব্লকের বহু সদস্যকে এইসময়ে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

ফরওয়ার্ড ব্লকের এই প্রচারকার্যে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিপুল সাড়া পাওয়া গেল। মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর অনুগামীরা তখন বুঝতে পারলেন যে, ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি জনসাধারণের কিছুমাত্র সমর্থন লাভ করবে না; তাতে করে তাঁদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা হ্রাস অনিবার্য। ফলতঃ ধীরে ধীরে তাঁরা তাঁদের মনোভাব পালটাতে আরম্ভ করলেন।

গান্ধীজীর মনোভাবের চেয়ে নেহরুর মনোভাব আরও বিস্ময়জনক। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ সন পর্যন্ত কংগ্রেসের যুদ্ধ-বিরোধী সমস্ত প্রস্তাবেই

তিনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ফলতঃ যুদ্ধ বাধবার পর স্বভাবতঃই জনসাধারণ আশা করেছিল যে, যুদ্ধ-বিরোধী নীতি গ্রহণে তিনিই নেতৃত্ব করবেন। পূর্বেকার প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় অসহযোগিতা করাই ছিল কংগ্রেসের কর্তব্য; এবং তারপরেও সরকার যদি যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষকে শোষণ করত, তবে কংগ্রেস দলের কর্তব্য ছিল সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ সরকারকে প্রতিরোধ করা। নেহরু যে শুধু সেই নীতি গ্রহণ করেননি তা নয়, যুদ্ধকালে কংগ্রেস যাতে ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত না করতে পারে তদুদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর সবটুকু প্রভাব কাজে লাগিয়েছিলেন।

যুদ্ধ সম্পর্কে কী মনোভাব অবলম্বন করা কংগ্রেসের কর্তব্য তা স্থির করবার জন্য ৮ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের কার্যকরী পরিষদের (ওয়ার্কিং কমিটি) এক বৈঠক হয়। আমি তখন এর সদস্য নই; তবে বৈঠকে যোগদানের জন্য আমাকে বিশেষ-আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অবিলম্বে স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হওয়া উচিত, ফরওয়ার্ড ব্লকের এই অভিমতই আমি সেখানে ব্যক্ত করি। সেইসঙ্গে একথাও আমি জানিয়েছিলাম যে, কংগ্রেসের কার্যকরী পরিষদ যদি এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহলে ফরওয়ার্ড ব্লক যে-কার্যে দেশের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হবার সম্ভাবনা বুঝবে তা-ই করবে।

এই আপোষবিহীন মনোভাবে ফল হলো, এবং গান্ধীপন্থী দল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার চিন্তা সম্পূর্ণ বর্জন করলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল ধরে আলাপ-আলোচনা চলল; অবশেষে ব্রিটিশ সরকার যাতে তাঁদের এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন তার জন্যে দাবী জানিয়ে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ওয়ার্কিং কমিটি একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। প্রস্তাবে আরও ঘোষণা করা হলো যে, ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে "আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বন এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ সানন্দে অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগদান করবে।"

এই প্রস্তাব আসলে কয়েকটি শর্তাধীনে ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবারই প্রস্তাব।

১৭ই অক্টোবর ভাইসরয় এক বিবৃতিতে কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের উত্তর দিলেন। বিবৃতিটি লণ্ডনে শ্বেতপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ভাইসরয় তাতে একটি পরামর্শ-পরিষদ (Consultative group) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদেরও তাতে গ্রহণ করা হবে, এবং যুদ্ধসংক্রান্ত

প্রশ্নাদি সম্পর্কে এই পরিষদ ভাইসরয়কে পরামর্শ দেবেন। ভবিষ্যতে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রদানের প্রতিশ্রুতিরও তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন। দশ বৎসর পূর্বে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (আরউইন) সর্বপ্রথম এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সরকারের এই উত্তরের কথা ছেড়ে দিলেও ভারতীয় জনসাধারণ যে-কারণে সর্বাপেক্ষা ক্ষুব্ধ হয়েছিল তা হলো এই যে, একদিকে মিত্রশক্তি যখন "স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র" রক্ষার জন্য সংগ্রামের কথা বলছিল, অন্যদিকে তখন ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সনের শাসনবিধি মুলতুবী রাখা হয়েছে, ভাইসরয় সর্ব-ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন এবং ভারতবর্ষের বহুস্থানেই কঠোরভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সভানুষ্ঠান ও মিছিল তখন নিষিদ্ধ হয়েছে, বিনাবিচারে সবাইকে বন্দী করে রাখা হচ্ছে, ইত্যাদি।

আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, প্রথম থেকেই কংগ্রেস যদি সামগ্রিকভাবে যুদ্ধবিরোধিতার নির্ভীক ও দৃঢ়সংকল্প মনোভাব অবলম্বন করত তাহলে ভারতবর্ষে ব্রিটেনের যুদ্ধসামগ্রী উৎপাদনের কাজ গুরুতরভাবে ব্যাহত হতো এবং ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের থেকে বহু দূরে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্যপ্রেরণও এত সহজসাধ্য হতো না। আমার মতে, যুদ্ধ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখে গান্ধীজী, নেহরু এবং তাঁদের অনুগামীরা ব্রিটিশ সরকারকে পরোক্ষভাবে সাহায্যই করেছেন। কংগ্রেস এ ব্যাপারে দেশকে তখন সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশ দান করেনি। এই কারণেই ভারতীয় জনসাধারণের একাংশের সহযোগিতালাভের ব্যাপারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুচরদের প্রচারকার্য অংশতঃ সফল হয়েছিল। এইটেই স্বাভাবিক।

২৯শে অক্টোবর তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ভাইসরয়ের ১৭ই অক্টোবরের ঘোষণার জবাব দেন। তাতে আইন অমান্যের (অথবা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের) ভয় দেখানো হয়েছিল। একইসঙ্গে কমিটি আটটি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগ করবার নির্দেশ দিলেন। ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-নীতি অনুযায়ী কাজ করবার জন্য ভাইসরয় তখন প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপরে আদেশ জারী করছিলেন। সুতরাং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সামনে তখন দুটি পথই মাত্র খোলা ছিল,—হয় যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা, আর না হয়তো পদত্যাগ করা।

আশা করা গিয়েছিল, কংগ্রেসী মন্ত্রিবৃন্দ পদত্যাগ করবার পর নিষ্ক্রিয়

প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করা হবে। সে আশা পূর্ণ হয়নি। অনেকে মনে করেন, ব্রিটিশ চক্রান্তই তার জন্য দায়ী। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে প্রভাবিত করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার কয়েকজন ব্রিটিশ লিবার‍্যাল ও ডেমোক্র্যাটকে ভারতে প্রেরণ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রখ্যাত লেখক মিঃ এডওয়ার্ড টম্‌সন্‌ ১৯৩৯ সনের অক্টোবর মাসে ভারত সফর করেন। তাঁর পরে, ডিসেম্বর মাসে, এলেন স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌।

যুদ্ধে সহযোগিতাদানের বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার স্বপক্ষে অবিরাম প্রচারকার্য চালানো ছাড়াও ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে মাঝে মাঝে এবিষয়ে তখন জনমত জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৩৯ সনের অক্টোবর মাসে নাগপুরে এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। ছ' মাস পরে ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে ফরওয়ার্ড ব্লকের এই প্রচারকার্য রামগড়ে এক বিরাট সম্মেলনানুষ্ঠানের মধ্যে এসে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে; সেখানে তখন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন চলছিল। রামগড়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন নিখিল ভারত আপোষবিরোধী সম্মেলন নামে অভিহিত হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণ সভা এই সম্মেলন আহ্বান করেছিল এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস-সভা অপেক্ষা এই সম্মেলন অধিকতর সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিল।

কংগ্রেস তার যুদ্ধ-নীতি সম্পর্কে রামগড়ে কোনও সিদ্ধান্ত করেনি। ছ মাস ধরে এই নীতি সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। ফলতঃ ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতবর্ষকে সমানে শোষণ করে যাচ্ছিলেন। রামগড়ে আমার এবং কিষাণ-নেতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত আপোষবিরোধী সম্মেলনে এ-কারণে অবিলম্বে যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-দাবীর ভিত্তিতে সংগ্রাম আরম্ভ করবার সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসে জাতীয় সপ্তাহে (৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল) ফরওয়ার্ড ব্লক কর্তৃক দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হয়। ব্লকের বিশিষ্ট নেতাদের ক্রমে ক্রমে কারারুদ্ধ করা হতে লাগল। আমি তখন বাংলাদেশে রয়েছি। সেখানেও আন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠল, এবং জুলাই মাসের প্রথম দিকে আমাকে ও আমার শত শত সহকর্মীকে কারারুদ্ধ করা হলো।

কারারুদ্ধ হবার কয়েকদিন পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪০ সনের জুন মাসে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর প্রধান প্রধান সহযোগীর সঙ্গে শেষবারের মত আমার সুদীর্ঘ

আলোচনা হয়। ভারতবর্ষ তখন ফ্রান্সের চূড়ান্ত পরাজয়ের সংবাদ পেয়েছে। বিজয়ী জার্মাণ সৈন্যদল এসে প্যারিসে প্রবেশ করেছে। ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ মনোবল তখন ভেঙে পড়বার উপক্রম। ব্রিটেনের জনৈক মন্ত্রীর তখন এই বলে ব্রিটিশ জনসাধারণকে ভর্ৎসনা করতে হয়েছিল যে, তাদের "বিরস মুখ দেখে মনে হয় যেন তারা শ্মশানযাত্রায় চলেছে।" ভারতবর্ষে তখন ফরওয়ার্ড ব্লকের আরব্ধ আইন অমান্য আন্দোলন চলছে, ব্লক-নেতাদের অনেকেই তখন কারারুদ্ধ। এ কারণে মহাত্মা যাতে তাঁর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করতে এগিয়ে আসেন, তার জন্যে তাঁর কাছে আমি ব্যগ্র আবেদন জানিয়েছিলাম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে ধ্বসে পড়বে সে কথা তখন দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, এবং এ-যুদ্ধে ভারতবর্ষের তখন আপন ভূমিকা গ্রহণ করবার সময়। তা সত্ত্বেও মহাত্মা স্পষ্ট কিছু বললেন না। পুনর্বার তিনি বললেন যে, তাঁর মতে দেশ তখনও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়; তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে গেলে ভারতবর্ষের তাতে করে শুভর চাইতে অশুভই হবে বেশী। যে যাই হোক, বহুক্ষণ ধরে খোলাখুলি আলোচনা চলবার পর তিনি বললেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে আমার প্রচেষ্টা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তো তিনিই সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে তার প্রেরণ করবেন।

অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ যথা মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীসাভারকরের সঙ্গেও ঐ সময়ে আমার আলোচনা হয়। ব্রিটিশদের সহায়তায় কীভাবে তাঁর পাকিস্তান পরিকল্পনাকে (ভারত-বিভাগ) কার্যে পরিণত করা যায়, মিঃ জিন্না তখন শুধু সেই চিন্তাই করছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করবার প্রস্তাবে তাঁর কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। এমনকি, এ-কথাও তাঁকে আমি বলেছিলাম যে, সত্যিই যদি সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম আরম্ভ হয় তো মিঃ জিন্নাই স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন। ওদিকে শ্রীসাভারকরের সঙ্গে আলাপ করে মনে হলো, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি আদৌ সচেতন নন। ব্রিটেনের ভারতস্থ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে হিন্দুরা কীভাবে সামরিক শিক্ষালাভ করতে পারে তিনি তখন সেই চিন্তাতেই মগ্ন। এই দুটি সাক্ষাৎকারের পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হলাম যে, মুসলিম লীগ অথবা হিন্দু মহাসভা—কারুর কাছ থেকেই কিছু আশা করা যেতে পারে না।

১৯৪০ সনের ২০শে মে তারিখে পণ্ডিত নেহরু একটি বিবৃতি দান করেন; বিবৃতিটি অত্যন্তই বিস্ময়জনক। তাতে তিনি বলেন, "ব্রিটেন

যে-সময়ে তার জীবন-মরণের সংগ্রামে ব্যাপৃত রয়েছে সেইসময়ে আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হলে ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা সম্মানহানিকর কাজ হবে।" একইভাবে মহাত্মাও বললেন, "ব্রিটেনের ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা-লাভ আমাদের কাম্য নয়। সে-পথ অহিংসার নয়।" স্পষ্টই বোঝা গেল যে, ব্রিটেনের সঙ্গে একটা আপোষরফা করবার জন্য গান্ধীবাদী দল যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

২৭শে জুলাই তারিখে পুনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সভা হয়। মহাত্মা তাতে উপস্থিত ছিলেন না। সভায় প্রস্তাব করা হয় যে, স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস যে দাবী জানিয়েছে তা মেনে নেওয়া হলে যুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে। মহাত্মা এইসময়ে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার কারণ, অহিংসায় বিশ্বাসী হবার দরুণ তাঁর পক্ষে যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৮ই অগাস্ট তারিখে ভাইসরয় কংগ্রেস-প্রস্তাবের উত্তর দেন। তাতে তিনি তাঁর শাসন-পরিষদ ও পরামর্শ-পরিষদে প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন ভারতীয়কে গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু, স্বাধীনতার সঙ্গে তার অনেক তফাৎ।

এদিকে, ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে আমাকে কারারুদ্ধ করবার পর, ক্রমবর্ধমান উদ্যোগে ফরওয়ার্ড ব্লকের আন্দোলন চলতে লাগল। এই আন্দোলনের ফলে গান্ধীপন্থী দলের সাধারণ কর্মীদের মনে প্রবল দোলা লাগে। গান্ধীপন্থী দলের অনুগামীদের উপর নির্দেশ ছিল, তারা যেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শুরু না করেন। তা সত্ত্বেও এই দলের সাধারণ কর্মীবৃন্দ, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবকরা, কয়েকটি প্রদেশে আন্দোলনে যোগদান করেন। তাতে করে গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সঞ্চার হলো। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সংগ্রাম আরম্ভ করবার জন্য মহাত্মাকে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলেন, অন্যথায় দেশে তাঁদের সমস্ত প্রভাব ও মর্যাদা নষ্ট হবে। অন্যেরা নির্দেশের প্রতীক্ষায় না থেকে ধীরে ধীরে সংগ্রামে যোগ দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীকে তাঁদের কথা মেনে নিতে হলো। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস তার সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়, এবং মহাত্মাকে পুনর্বার নেতৃত্বে গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৪০ সনের অক্টোবর মাসে মহাত্মা ঘোষণা করলেন যে তিনি ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন; তবে এই প্রতিরোধের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু করা হবে না। ১৯৪০ সনের নবেম্বর মাসে গান্ধীজীর আন্দোলন আরম্ভ হলো। তারপর

অল্পকালের মধ্যেই আটটি প্রদেশের আন্দোলনে-অংশগ্রহণকারী কংগ্রেসী মন্ত্রি-বৃন্দ এবং সেইসঙ্গে শত শত প্রভাবশালী নেতাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

১৯২১ অথবা ১৯৩০-৩২ সনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, সেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে মহাত্মা গান্ধী ১৯৪০-৪১ সনের আন্দোলন পরিচালনা করেননি। অথচ বাস্তব বিচারে দেশ এসময়ে বিপ্লবের জন্য আগের চাইতে বেশী তৈরী ছিল। তার থেকে বোঝা যায় যে, তখনও পর্যন্ত গান্ধীজী আপোষের পথ খোলা রাখতে চেয়েছিলেন; আন্দোলন চলতে থাকাকালে ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে খুব বেশী তিক্ততার সৃষ্টি হলে আর তা সম্ভব হতো না। সে যাই হোক্, গান্ধীজী যে অবস্থাকে মেনে না নিয়ে পারেননি, ফরওয়ার্ড ব্লক তাতে উৎসাহিত হয়ে উঠল; গান্ধীপন্থী দল ও ফরওয়ার্ড ব্লক—কংগ্রেসের এই উভয় পক্ষই যখন সুনির্দিষ্টভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী ও যুদ্ধ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তখন বৃহত্তর পরিকল্পনার কথা ভাবা যেতে পারে।

বিনা বিচারে আমাকে তখন কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও এ-সম্পর্কে চিন্তার ফলে তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম। প্রথমতঃ ব্রিটেন এ-যুদ্ধে পরাজিত হবে, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়বে। দ্বিতীয়তঃ সংকটগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ-শক্তি ভারতীয় জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবে না, ভারতীয় জনসাধারণকে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। তৃতীয়তঃ, এ-যুদ্ধে ভারতবর্ষ যদি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে স্বভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধনিরত শক্তিসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তাহলে সে স্বাধীনতা লাভ করবে। এর থেকে আমি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলাম যে, ভারতবর্ষের পক্ষে সক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করা কর্তব্য।

ইতিপূর্বে এগারো বার আমাকে ব্রিটিশ কারাগারে বন্দীজীবন যাপন করতে হয়েছে। কিন্তু এবারে আমার মনে হলো যে, অন্যত্র যখন ইতিহাসের রূপান্তর ঘটতে চলেছে সেই মুহূর্তে আমি যদি নিষ্ক্রিয়ভাবে কারাগারে বন্দী থাকি তবে তা এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক ভ্রান্তির সামিল হবে। আমি তখন আইনগত-ভাবে মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করতে লাগলাম; দেখলাম যে সেরকম কোনও উপায় নেই। তার কারণ ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে বন্দী করে রাখতেই কৃতসংকল্প। তখন আমি সরকারের কাছে একটি চরমপত্র প্রেরণ করি। তাতে আমি বলেছিলাম যে, এইভাবে আমাকে কারাগারে আটক করে রাখার নৈতিক অথবা আইনগত কোনও যৌক্তিকতা নেই; অবিলম্বে

আমাকে মুক্তি দেওয়া না হলে আমি আমরণ অনশন আরম্ভ করব। জীবিতাবস্থাতেই হোক্ আর মৃতাবস্থাতেই হোক্, মুক্তিলাভ করতে আমি কৃতসংকল্প।

সরকার এই চরমপত্রটিকে হেসে উড়িয়ে দিলেন; উত্তর দিলেন না। শেষ মুহূর্তে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার ভ্রাতা প্রাদেশিক আইন-সভায় কংগ্রেস দলের নেতা শরৎচন্দ্র বসুকে এইমর্মে অনুরোধ জানালেন যে, এটা যে একটা উন্মাদ-পরিকল্পনা এবং সরকার যে এব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন না সেকথা যেন তিনি আমাকে জানিয়ে দেন। রাত্রে আমার ভ্রাতা বন্দী-সেলে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর কথা তিনি আমাকে জানালেন। সেইসঙ্গে আরও বললেন যে, সরকারের মনোভাব অত্যন্তই প্রতিকূল। ঘোষণা অনুযায়ী পরদিন সকাল থেকেই আমার অনশন শুরু হলো। সাতদিন পরে কর্তৃপক্ষ অকস্মাৎ ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁদের আশঙ্কা হলো যে, কারাগারেই আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। তাড়াহুড়ো করে ঊর্ধতন কর্মচারীদের এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো এবং এইমর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে এখন আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে, তবে মাসখানেক পরে, স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবামাত্রই পুনর্বার আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

মুক্তিলাভের পর দিন-চল্লিশেক আমি স্বগৃহে ছিলাম, তখন আমি আমার শয়নকক্ষ ছেড়ে বাইরে যাইনি। ঐ সময়ে সমগ্র যুদ্ধ-পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলাম যে, বহির্জগতে কী ঘটছে ভারতীয় মুক্তি-যোদ্ধাদের সে-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন; সেইসঙ্গে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাবার প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করাই তাঁদের কর্তব্য। কীভাবে তা সম্ভব হতে পারে সে-সম্পর্কে বিভিন্ন পন্থার কথা বিবেচনা করে আমি বুঝতে পারলাম যে, স্বয়ং বাইরে চলে যাওয়া ছাড়া আর অন্যকোনও পথ নেই। ১৯৪১ সনের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে একদিন গভীররাত্রে আমি গৃহত্যাগ করলাম। গোয়েন্দা-পুলিশদল সারাক্ষণ আমার উপরে সতর্ক নজর রেখেছিল। তা সত্ত্বেও তাদের চোখে ধূলো দিয়ে এক রোমাঞ্চকর পথ-পর্যটনের মধ্য দিয়ে আমি ভারতবর্ষের সীমান্ত অতিক্রম করতে সক্ষম হলাম। দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষে এত বড় চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ঘটনা আর ঘটেনি।

১৯৪১ সনে আইন অমান্য আন্দোলন চলতে লাগল; তবে গান্ধীজী এবং তাঁর অনুসারীদের পক্ষ থেকে খুব বেশী উৎসাহ ছিল না। মহাত্মা ভেবেছিলেন যে, নরম নীতি অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত তিনি আপোষের দরজা খুলে দিতে

পারবেন। কিন্তু তাঁকে নিরাশ হতে হলো। তাঁর মহত্ত্বকে দুর্বলতা বলে ধরে নেওয়া হলো এবং ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের ব্যাপারে যথাসাধ্য ভারতবর্ষকে শোষণ করে যেতে লাগলেন। সেইসঙ্গে ব্রিটেনের কাছে যাঁরা আত্মবিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সরকার সেইসমস্ত লোককে যথা প্রাক্তন কমিউনিস্ট-নেতা এম. এন. রায় প্রভৃতিদের পুরোপুরিভাবে কাজে লাগালেন।

অবশেষে ১৯৪১ সনের নবেম্বর মাসে দূরপ্রাচ্যের দিগন্তে যুদ্ধের কৃষ্ণমেঘ দেখা দেবার পর ব্রিটিশ সরকারের আত্মতুষ্ট মনোভাবের অবসান ঘটল। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে গান্ধীপন্থী দলভুক্ত কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে অকস্মাৎ মুক্তিদান করা হলো। কিন্তু, একইসঙ্গে বামপন্থী নেতৃবৃন্দকে তখন কারারুদ্ধ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দূরপ্রাচ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর আমার ভ্রাতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসুকে বিনাবিচারে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল। এর কিছুকাল পরে ফরওয়ার্ড ব্লকের অস্থায়ী সভাপতি সর্দার শার্দূল সিং কবিশেরকে কারারুদ্ধ করা হলো। সরকার সম্ভবতঃ ভেবেছিলেন যে, বামপন্থীদের গ্রেপ্তার ও গান্ধীপন্থীদের মুক্তিদান করবার এই দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করেই কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁরা একটা মীমাংসায় উপনীত হতে পারবেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষের জন্য ব্রিটিশ সরকারের এই যে অভিলাষ, গান্ধী-পন্থী দলের কাছ থেকে তাতে সাড়া পাওয়া গেল। ১৯৪২ সনের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক হয়। পুনর্বার যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতার ইচ্ছা জানিয়ে সেখানে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। এর ঠিক পরেই ১৯৪২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছাক্রমে মার্শাল চিয়াং কাইশেক ভারত-সফরে এলেন। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হবার জন্য কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে রাজী করানোই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। এর একমাস পরে ১৯৪২ সনের মার্চে একটি মার্কিণ কারিগরী মিশন, কতিপয় মার্কিণ কূটনীতিক ও সাংবাদিক এবং কয়েকটি মার্কিণ সামরিক ইউনিট ভারতে উপনীত হন। এপ্রিল মাসেই ভারতস্থ ব্রিটিশ প্রধান সৈনাধ্যক্ষ মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সাহায্যপ্রার্থনা করে ব্রহ্মে চীনা সৈন্যদল আমদানি করতে বাধ্য হলেন।

১৯৪২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, এক সপ্তাহের যুদ্ধের পর, সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে। এর ফলে ব্রিটেন ও অ্যামেরিকায় উদ্বেগের সঞ্চার হলো। মালয়-অভিযান শেষ করে জাপানী সৈন্যদল ব্রহ্মদেশে এসে প্রবেশ করে; ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তখন একটি নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করতে বাধ্য হন। যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌য়ের ভারত-

সফরের কথা ঘোষণা করে ১১ই মার্চ তারিখে তিনি আপোষ-মনোভাবব্যঞ্জক এক বক্তৃতা দেন।

১৯৪২ সনের মার্চ মাসে অনুকূল অবস্থার মধ্যে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ ভারতবর্ষে এসে পৌঁছুলেন। জাপানী সৈন্যদলের দ্রুত ও আশ্চর্য অগ্রগতিতে ব্রিটিশ সরকারের মেজাজ তখন নরম হয়ে এসেছে; যে-কাজে ক্রীপ্‌স্‌কে পাঠানো হলো জনসাধারণ মনে করল যে তিনি তার উপযুক্ত লোক। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। তার কারণ, যুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্‌ প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর অন্যকিছুই তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেননি। প্রতিশ্রুতিপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এইমর্মে ভীতিপ্রদর্শনও করা হলো যে, যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে সম্ভবতঃ বিভক্ত করা হবে। ১০ই এপ্রিল তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই যুক্তিতে ক্রীপ্‌স্‌য়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন যে, এ-প্রস্তাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের দাবীকে কিছুমাত্রও মেনে নেওয়া হয়নি। ১১ই এপ্রিল তারিখে বেতারযোগে ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি বিদায়-বাণী জানিয়ে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ নিরাশ হৃদয়ে ভারত পরিত্যাগ করলেন।

ক্রীপ্‌স্‌য়ের ভারতত্যাগের পর ২৭শে এপ্রিল ও তারপর কয়েকদিন এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়। ১লা মে তারিখে ক্রীপস্‌-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ও কোনও বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী ভারতে প্রবেশ করলে অহিংস অসহযোগের আশ্রয় নেওয়া হবে এইমর্মে সংকল্প জ্ঞাপন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ না হওয়ায় জাপানী অথবা অন্য কোনও সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গে একযোগে সংগ্রাম করবার এখানে কোনও কথাই উঠতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী এই বৈঠকে যোগদান করেননি। তবে কমিটির কাছে তিনি একটি খসড়া প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলেন। নেহরু এবং আরও কয়েকজন সদস্য তার কঠোর সমালোচনা করেন। নেহরু বললেন, "খসড়াটির পটভূমিকা এমন যে সমগ্র বিশ্ব মনে করবে, পরোক্ষভাবে আমরা চক্রশক্তির সঙ্গেই যোগদান করছি।" নেহরু অতঃপর আর-একটি খসড়া প্রস্তুত করলেন। এটিও প্রথমে অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছিল। পরে কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ব্যগ্র আবেদনের ফলে সর্বসম্মতিক্রমে এটি গৃহীত হয়। নেহরুর খসড়াটিকে সমর্থন করে কংগ্রেস-সভাপতি বললেন যে, অর্থের দিক থেকে মহাত্মার মূল-খসড়া ও নেহরুর এই খসড়াটির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, পার্থক্যটা শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর।

মহাত্মা তাঁর মূল খসড়া-প্রস্তাবে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেছিলেন :—

“ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে ব্রিটেন অক্ষম।... ভারতীয় সৈন্যবাহিনী একটা বিচ্ছিন্ন সংস্থামাত্র, ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। এবং কোনও ক্রমেই তারা একে আপন বলে গণ্য করতে পারে না। জাপানের বিরোধ ভারতবর্ষের সঙ্গে নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেই সে যুদ্ধনিরত। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে খুব সম্ভবতঃ জাপানের সঙ্গে আলোচনারম্ভই হবে তার প্রথম কাজ। কংগ্রেস মনে করে যে, ব্রিটিশ-শক্তি যদি ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেয়, সেক্ষেত্রে জাপানী অথবা অন্য কোনও অভিযানকারী দ্বারা আক্রান্ত হলেও ভারতবর্ষ নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।” ঐ একই খসড়া-প্রস্তাবে কমিটি কর্তৃক জাপ সরকার ও জনসাধারণকে আশ্বস্ত করা হয় যে, জাপানের প্রতি ভারতবর্ষ শত্রুভাবাপন্ন নয়, ইত্যাদি। নেহরুর যে-খসড়াটি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলো তাতে জাপান সম্পর্কে অথবা ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার ব্যাপারে ব্রিটেনের অক্ষমতার কোনও উল্লেখ ছিল না।

কয়েকমাস পরে গান্ধীজীর খসড়া-প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী প্রচার-কার্য চালিয়ে ব্রিটিশ সরকার খুব একটা হৈ চৈ সৃষ্টি করলেন। একইসঙ্গে গান্ধীজীকে তাঁরা চক্রশক্তিপন্থী বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

সে যাই হোক্, উপর্যুক্ত খসড়া-প্রস্তাবে আপত্তিকর কিছুই ছিল না। ফরওয়ার্ড ব্লক কর্তৃক স্থিরনির্দিষ্টভাবে যে-নীতি প্রচার করে আসা হয়েছে, এই খসড়া-প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের সঙ্গে তার পূর্ণ সঙ্গতি বিদ্যমান।

বহু-সমালোচিত এই খসড়া-প্রস্তাবটি থেকে উপলব্ধি করা গেল যে, গান্ধীজীর মধ্যে নেহরুর মত আদর্শগত কোনও গোঁড়ামি ছিল না। নেহরুর অপেক্ষা তিনি ঢের বেশী বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন। কংগ্রেস-আন্দোলন থেকে রাজাগোপালাচারীর বিদায়গ্রহণই কংগ্রেসের এই বৈঠকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষরফার তিনিই ছিলেন প্রধান সমর্থক।

ক্রীপ্‌স্‌ মিশনের ব্যর্থতার পর জনসাধারণ ধরে নিল যে, ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে আপোষ-আলোচনাপর্ব এবারে শেষ হয়েছে; দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতাও তাই অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও পণ্ডিত নেহরু এইমর্মে প্রচার আরম্ভ করলেন যে, আপোষ না হলেও ব্রিটেনের সঙ্গে একযোগে ফ্যাসিজ্‌ম্‌য়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোই ভারতবর্ষের কর্তব্য। মহাত্মা গান্ধী অথবা গান্ধীপন্থী দল অথবা জনসাধারণ, কেউই তাঁর এই অভিমত মেনে নেননি। শেষ পর্যন্ত নেহরুকেই নতিস্বীকার করে মহাত্মার অভিমত মেনে নিতে হয়।

ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার একগুঁয়েমির ফলে কংগ্রেসকর্মীদের

অধিকাংশই ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন যে, ব্রিটেনের সঙ্গে একটা প্রকাশ্য সংঘর্ষ অনিবার্য; তবে আপোষরফার আশাও তখনো একেবারে বিদায় নেয়নি।

কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ক্রীপ্‌স্‌-প্রস্তাবের অতিরিক্ত আর কিছুই ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আশা করবার ছিল না; সুতরাং অবিলম্বে স্বাধীনতালাভের দাবীকে রূপায়িত করে তোলা ছাড়া কংগ্রেসের সামনে তখন আর অন্য কোনও পথ নেই। ভারতবর্ষের জনমতও অশান্ত হয়ে উঠেছিল এবং দ্বিধাগ্রস্ত-নীতিকে অব্যাহত রাখা আর তখন সম্ভব ছিল না। কংগ্রেসের ১৪ই জুলাইয়ের প্রস্তাবেও বলা হয়েছিল যে, "ব্রিটেনের বিরুদ্ধে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে বিদ্বেষভাব বেড়ে চলেছে এবং জাপ-বাহিনীর সাফল্যে সন্তোষের সঞ্চার হচ্ছে।" নির্দিষ্ট কিছু করবার তখন সময় উপস্থিত।

দু'মাস ধরে অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় থাকবার পর শেষ পর্যন্ত ১৯৪২ সনের ৬ই জুলাই তারিখে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক সুরু হলো। ৯ দিনব্যাপী আলোচনার পর ১৪ই জুলাই তারিখে বিখ্যাত "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে ঘোষণা করা হলো যে, "অবিলম্বে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসনের অবসান ঘটাতে হবে।" প্রস্তাবে আরও বলা হলো যে, এই "আবেদনে" যদি কর্ণপাত করা না হয় তাহলে "রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ১৯২০ সনে অহিংসাকে আপন নীতির অঙ্গীভূত করবার পর থেকে কংগ্রেস এযাবৎ যতখানি অহিংস শক্তি অর্জন করেছে", অনিচ্ছাসত্ত্বেও কংগ্রেসকে গান্ধীজীর অবিসংবাদী নেতৃত্বে সেই শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হতে হবে। কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশের ইচ্ছাকেই যে প্রায় সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত করে তোলা হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সর্বসময়েই আমি এইরূপ বিবেচনা করে এসেছি যে, ভারতে ব্রিটিশ-শক্তির ধ্বংসই হলো ভারতবর্ষের সর্বসমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়, এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য ভারতীয় জনসাধারণকে সংগ্রাম করতে হবে। পূর্বোক্ত প্রস্তাব গ্রহণের ফলে মূলগতভাবে কংগ্রেস আমার এই নীতিরই নিকটবর্তী হয়েছে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে আশু আপোষবিহীন সার্বিক সংগ্রাম-নীতির কথা আমি বলে এসেছি, কংগ্রেস নেতৃত্ব সামগ্রিকভাবে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল; ওয়ার্ধায় গৃহীত কংগ্রেস প্রস্তাবকে গান্ধীজী "প্রকাশ্য বিদ্রোহ" বলে ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও সে-ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে ঘোচেনি। প্রস্তাবে

যে-সমস্ত কথা বলা হয়েছিল, যথা "যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে গ্রেট ব্রিটেন অথবা মিত্রশক্তিকে বিব্রত করবার" কিংবা "মিত্রশক্তির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে বিপদগ্রস্ত করবার" কোনও ইচ্ছাই কংগ্রেসের নেই, অথবা—ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হলে প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে মিত্রপক্ষীয় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনে কংগ্রেস সম্মতিপ্রদান করবে বলে যে-কথা বলা হয়েছিল তাতে করে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কিছু কিছু কংগ্রেস-নেতা তখনও পর্যন্ত ব্রিটেনের সঙ্গে একটা আপোষরফার বাঞ্ছনীয়তা এবং এই বাঞ্ছিত আপোষরফার সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করছেন। ২৭শে মে তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে গান্ধীজী তাঁর খসড়া-প্রস্তাবে পেশ করে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, উপর্যুক্ত কথাগুলির থেকে বুঝতে পারা যায় যে, কংগ্রেস তার থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এই খসড়া-প্রস্তাবটিতে অন্যান্য কথার মধ্যে এ-কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল যে, জাপানের বিরোধ ভারতবর্ষের সঙ্গে নয়; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেই সে যুদ্ধনিরত; যুদ্ধে ভারতবর্ষের অংশগ্রহণের ব্যাপারে ভারতীয় জনসাধারণের সম্মতি নেওয়া হয়নি; এবং ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে খুব সম্ভবতঃ জাপানের সঙ্গে আলোচনারম্ভই হবে তার প্রথম কাজ। বস্তুতঃ জনকয়েক কংগ্রেস-নেতা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছিলেন তাতে করে এতখানি আশাও তাঁরা করতে পারলেন যে, সম্মিলিত শক্তিবর্গ বিশেষতঃ অ্যামেরিকা হয়তো ভারতবর্ষের জাতীয় দাবীর স্বপক্ষে ভারতীয় প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

সে যাই হোক্, এই ধরণের লোকেরা তখন সংখ্যায় নিতান্তই মুষ্টিমেয়। ব্রিটেনের সঙ্গে একটা মীমাংসা করতে নেহরুই ছিলেন সর্বাধিক ইচ্ছুক। তৎসত্ত্বেও "যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হবে বলে ব্রিটেন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অ্যামেরিকা সে সম্পর্কে কোনও নিশ্চয়তাপ্রদান করলে চলবে কিনা," ওয়ার্ধা-বৈঠকের পর বৈদেশিক সংবাদাতাদের এই প্রশ্নের উত্তরে নেহরু পর্যন্ত নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, "কংগ্রেস এইমুহূর্তে স্বাধীনতা চায়।" দেশেরও তখনও এই একই মনোভাব।

ক্রীপ্‌স্‌য়ের দৌত্যের ফলে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া দূষিত হয়ে উঠেছিল; "ভারত-ছাড়ো" প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস তাকে আবার পরিশ্রুত করে তুলল। পারস্পরিক মতবিরোধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভের জাতীয় দাবী দুর্বল হয়ে পড়বে এরকম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল; আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভের কথা ঘোষণা করে কংগ্রেস সেই সম্ভাব্য দুর্বলতাকে

প্রতিরোধ করল। স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌কে ভারতে পাঠিয়ে ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতালাভের জাতীয় দাবীর মধ্যে ঘুণ ধরিয়ে দিতেই চেয়েছিলেন।

৭ই আগস্ট তারিখে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন সুরু হবে বলে স্থিরীকৃত ছিল। ওয়ার্ধায় গৃহীত প্রস্তাবটিকে সেখানে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করবার পূর্বে এ-সম্পর্কে পুনর্বার আলোচনার্থে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অগাস্ট মাসের প্রথম দিকে বৈঠক আহ্বানের সিদ্ধান্ত করলেন। অগাস্ট মাস যত এগিয়ে আসতে লাগল, দেশের রাজনৈতিক উত্তেজনাও ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। ভারতস্থ ব্রিটিশ সংবাদ-দাতারা সেইসময়ে তাঁদের প্রেরিত সংবাদাদিতে অভিযোগ করেছিলেন যে, জনসাধারণের প্রতি বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়ে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ "দেশের উপর জবরদস্তি করছেন"। অচলাবস্থার সমাধানার্থে যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন কোনও পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কংগ্রেস যাতে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম আরম্ভ না করে, মধ্যপন্থী ও উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেজন্যে তখন প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাতে করে বুঝতে পারা গেল যে, দেশে তখন যে রাজনৈতিক উত্তেজনা বর্তমান কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত তার এক বৈপ্লবিক পরিণতির দিকেই অঙ্গুলীনির্দেশ করেছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক ৪ঠা অগাস্ট যে খসড়া-প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, ৭ই অগাস্ট তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সে-সম্পর্কে আলোচনারম্ভের কথা ছিল। যে মনোভাব এই খসড়া-প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছিল, 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার সংবাদদাতা তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, জুলাইয়ের মধ্যভাগে ওয়ার্ধায় যে-প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় সে-তুলনায় এ-প্রস্তাব "অধিকতর গঠনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন"। স্বাধীন ভারত ব্রিটেনের স্বপক্ষে এ-যুদ্ধে "তার সর্বসম্পদ নিয়োগ করবে", এই আশ্বাস-বাণীর থেকে বুঝতে পারা গেল যে, স্বাধীন ভারত পৃথকভাবে শান্তিস্থাপনের কথা চিন্তা করবে না বলেই কংগ্রেস মনে করে। এর থেকেই উপলব্ধি করা যাবে যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম সুরু করবার পূর্বে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে কংগ্রেস তার শান্তি-প্রস্তাব তুলে ধরেছিল।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও তখন চুপ করে বসে নেই। কংগ্রেসের উপরে দ্রুত ও কঠিন আঘাত হানবার জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে দমনমূলক ও বেআইনী ব্যবস্থাবলম্বনের উপরে নিয়মতান্ত্রিকতার একটা খোলস পরিয়ে দেবার জন্য, নিখিল ভারত কংগ্রেস

কমিটি কর্তৃক "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব অনুমোদিত হবার অব্যবহিত পরেই, ভারত সরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীসুলভ ভঙ্গীতে নিজেদের কার্যের সমর্থনে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করেন। অবিলম্বে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ-শক্তিকে বিদায় নিতে হবে, কংগ্রেসের এই দাবী, এবং "অহিংস পন্থায় ব্যাপকভাবে গণ-আন্দোলন" সুরু করা হবে, এই সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে সরকারী বিবৃতিটিতে ঘোষণা করা হলো যে, "যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জরুরী কার্যাদিতে বিঘ্নসৃষ্টি, ধর্মঘট সংগঠন, সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্যে হস্তক্ষেপ, লোকসংগ্রহে বাধাপ্রদান ও অন্যান্যভাবে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যাঘাতসৃষ্টি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বে-আইনী এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সহিংস কার্যকলাপের জন্য কংগ্রেস দলের যে বিপজ্জনক প্রস্তুতি চলছে, বিগত কয়েকদিন ধরে সরকার সে সম্পর্কে অবহিত আছেন"। বিবৃতিটি ব্রিটিশ ভণ্ডামির একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাতে আরও বলা হলো, ভারত সরকার বিবেচনা করেন যে, "ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি" সরকারের "যে দায়িত্ব রয়েছে", কংগ্রেসের দাবী মেনে নিলে সেই দায়িত্বকেই যে শুধু অস্বীকার করা হবে তা নয়, "ভারতে ও ভারতের বাইরে অবস্থিত মিত্রপক্ষ, বিশেষতঃ রাশিয়া ও চীনের প্রতি তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। ভারতবর্ষের মনপ্রাণ থেকে যে-আদর্শকে সমর্থন করে আসা হয়েছে এবং এখনো সমর্থন করা হচ্ছে, সেই আদর্শের প্রতিও তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে......"। চার্চিল এবং মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক অ্যাটলাণ্টিক সনদে মহা আড়ম্বরসহকারে যে স্বাধীনতা নীতি বিবৃত করা হয়েছিল, ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীনতালাভের জাতীয় সঙ্কল্পকে পাশবিকভাবে দমন করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার সেই স্বাধীনতার নীতিকেই সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেছেন।

শনিবার রাত্রে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হলো। ৯ই অগাস্ট রবিবার ভোররাত্রেই ভারত সরকার আঘাত হানলেন। বোম্বাইয়ের ব্রিটিশ পুলিশ কমিশনার মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করতে এলে তিনি তাঁর প্রভাতকালীন প্রার্থনাসমাপনের জন্য আধ ঘণ্টা সময় চাইলেন। গান্ধীজীর শেষ বাণী : হয় স্বাধীনতালাভ, নয় মৃত্যু।

পুলিশ ওদিকে বোম্বাইয়ে সমবেত ও অন্যত্র কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের সকলকেই গ্রেপ্তার করে চলেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেশব্যাপী শাখাপ্রশাখাসমেত সমগ্র কংগ্রেস-আন্দোলন এক গুপ্ত-আন্দোলনে পরিণত হলো। যে মুখোস এঁটে চার্চিল-অ্যামেরি গোষ্ঠী এতকাল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সমর্থক সেজে

বসেছিল, সেই মুখোস তখন খসে পড়েছে; ভারতীয় জনসাধারণের দৃষ্টির সামনে তখন হৃদয়হীন এক বৈদেশিক স্বৈরতন্ত্রের ভয়ঙ্কর মুখচ্ছবির আবরণ উদ্ঘাটিত হয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সুরু হলো।

সংযোজিত অংশ

(১)

সংগ্রাম ও পরবর্তীকাল*

বন্ধুগণ,—দেশের ইতিহাসের এক চরম সংকটকালে আপনারা প্রবাসী ভারতীয়দের এক রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বানের যে সিদ্ধান্ত করেছেন তার জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই। ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের এই তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনারা সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন। যে-সম্মান আপনারা আমাকে দিলেন, তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আমরা এক অহিংস সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। কিন্তু একটানা কঠোর সংগ্রামের মধ্যে অকস্মাৎ বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করলে কোনও সৈন্যবাহিনীর যেরকম অবস্থা হয়, আমাদের অবস্থাও আজ সেইরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে আত্মসমর্পণ করতে হলো কেন? জাতি চায়নি যে, আত্মসমর্পণ করা হোক্; জাতীয় বাহিনী যে নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অতঃপর যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হয়েছে তা-ও নয়; এমনও নয় যে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও যে আত্মসমর্পণ করতে হলো তার কারণ বোধহয় এই যে, ক্রমাগত অনশনের দরুণ সৈন্যাধ্যক্ষ অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন, আর না হয়তো নীতিগত এমন কতকগুলি কারণে তাঁর মন ও বিবেচনাবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, বাইরের লোকের পক্ষে যা উপলব্ধি করা অসম্ভব।

প্রশ্ন করি, অন্য আর কোনও দেশে এরকম কিছু ঘটলে তার পরিণাম কী দাঁড়াত? শত্রুপক্ষের কাছে গত মহাযুদ্ধের সময় যে সমস্ত সরকার আত্মসমর্পণ করেছিলেন, যুদ্ধান্তে তাঁদের পরিণাম কী হয়েছিল? কিন্তু ভারতবর্ষ বড় বিচিত্র দেশ।

১৯২২ সনে বার্দোলীতে যে ভাবে পশ্চাদপসরণ করা হয়েছিল, ১৯৩৩ সনের এই আত্মসমর্পণ তারই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯২২ সনে তবু

---

* ১৯৩৩ সনের ১০ই জুন লণ্ডনের ফ্রায়ার্স হলে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষণ।

সেই পশ্চাদপসরণের সমর্থনে, অসন্তোষজনক হলেও, একটা কিছু যুক্তি দেখানো যেত। চৌরীচৌরায় যে সহিংস কার্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ১৯২২ সনে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখবার স্বপক্ষে সেইটিকেই কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু ১৯৩৩ সনের এই আত্মসমর্পণের স্বপক্ষে কোন্ যুক্তি অথবা অজুহাত দেখানো সম্ভব?

১৯২০ সনে যে অসহযোগ আন্দোলন সুরু করা হয়েছিল—কোনও-না-কোনও আকারে সে-আন্দোলন অদ্যাবধি বর্তমান—গুরুত্বপূর্ণ ১৯২০ সনে সেইটেই ছিল ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ আন্দোলন। রাজনৈতিক ভারতবর্ষ তখন অধিকতর সক্রিয় কোনও কর্মপন্থার জন্য অপেক্ষমান। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, জনসাধারণের অবিসংবাদী মুখপাত্ররূপে এগিয়ে আসবার এবং একটির পর একটি জয়লাভের পথে তাদের পরিচালনা করবার মত ক্ষমতা তখন একজনেরই মাত্র ছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধী। গত দশবৎসরকালের মধ্যে ভারতবর্ষ যে একশত বৎসরের পথ অতিক্রম করে এগিয়ে এসেছে, সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু আজ ভারতীয় ইতিহাসের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অতীতের ভ্রান্তিগুলোকেও একবার উপলব্ধি করা প্রয়োজন; তাহলেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপকে ঠিকপথে পরিচালিত করতে এবং সম্ভাব্য সর্বপ্রকার বিঘ্ন থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হব।

স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে দুটি পথ আমাদের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে। একটি হলো আপোষবিহীন সংগ্রামের পথ, অন্য পথটি আপোষ-মীমাংসার। প্রথম পথটি অবলম্বন করলে যে-পর্যন্ত না আমরা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারছি ততদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এবং স্বাধীনতা-অর্জনের পথে আপোষের কথা চিন্তা করা চলবে না। পক্ষান্তরে আমরা যদি দ্বিতীয় পথটি অবলম্বন করি তো সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝে, পুনর্বার চেষ্টায় নিরত হবার পূর্বে নিজেদের অবস্থাকে সুসংহত করে নেবার উদ্দেশ্যে, বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আপোষের প্রয়োজন হতে পারে।

গোড়াতেই সকলের উপলব্ধি করা উচিত, গত তের বৎসর যাবৎ যে-পথে আমরা আন্দোলন চালিয়ে এসেছি তা আপোষবিহীন সংগ্রামের পথ, না আপোষ-মীমাংসার পথ—সেটা আদৌ স্পষ্ট নয়। আদর্শগত এই অস্পষ্টতার দরুণ বহু অনিষ্ট সাধিত হয়েছে। আমাদের নীতি যদি আপোষবিহীন সংগ্রামের নীতি হতো, ১৯২২ সনের বার্দোলী-আত্মসমর্পণ তাহলে ঘটতেই পারত না; ১৯৩১ সনের মার্চ মাসের দিল্লী-চুক্তিও তাহলে সাধিত হতো না। পক্ষান্তরে আমাদের পথ যদি আপোষ-মীমাংসারই পথ হতো তো সেক্ষেত্রে ১৯৩১ সনের

ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল, সে সুযোগ আমরা কিছুতেই নষ্ট করতাম না। ১৯৩১ সনের মার্চ মাসে যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল, আমাদের দিক থেকে তা আপোষ-মীমাংসার অনুকূল নয়; তা সত্ত্বেও সে-সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে শান্তিস্থাপন করা হলো। তাছাড়া আমাদের তৎকালীন শক্তির কথা বিবেচনা করে দেখলে বলতে হয় যে, সেই শান্তিপ্রতিষ্ঠার শর্তাবলী আদৌ সন্তোষজনক হয়নি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক যোদ্ধা হিসেবে আমরা যথেষ্ট-পরিমাণ সাংগ্রামিকতা অথবা যথেষ্ট-পরিমাণ কূটনৈতিক বুদ্ধি—কোনটিরই পরিচয় দিতে পারিনি।

একদিকে অস্ত্রহীন পরাধীন ভারতবাসী এবং অন্যদিকে প্রথম-শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গ্রেট ব্রিটেনের এই যুদ্ধে জনসাধারণের উদ্দীপনা ও সরকার-বিরোধী মনোভাবকে অটুট রাখতে পারলে তবেই আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তিলাভে সমর্থ হব। এই মানসিক অবস্থার দিকটি আমাদের ক্ষেত্রে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে, সশস্ত্র এবং সুশিক্ষিত দুই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ততখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিত না। ১৯২২ সনে সমগ্র জাতি যখন এক বিপুল কর্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং জনসাধারণের কাছে যখন আরও নির্ভীকতা ও আত্মত্যাগ আশা করা যেতে পারত, আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ তখন অকস্মাৎ শ্বেত পতাকা উত্তোলন করে বসলেন। অথচ তারই কয়েকমাস পূর্বে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে একটা সম্মানজনক আপোষের অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সে-সুযোগের তিনি সদ্ব্যবহার করেননি।

অতীত ইতিহাসের থেকে শিক্ষালাভ করা অথবা সে-শিক্ষা মনে রাখা সহজ-সাধ্য কাজ নয়; এবং ভারতবর্ষের সর্বশেষ অবস্থা থেকে এইটেই প্রমাণিত হয় যে, এখনও পর্যন্ত আমরা ১৯২১ ও ১৯২২ সনের শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে পারিনি। ভারতবর্ষ আজ যে রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে, দেশবন্ধু সি. আর. দাশ এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সেই সঙ্কটের থেকে তাকে রক্ষা করতে পারতেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, রাজনীতিক্ষেত্রের এই দুই পুণ্যস্মৃতি মহীরুহ যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯৩১ সনে আমাদের মধ্য থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন।

১৯২৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। দেশবাসীর চিত্ত যে তখন কতখানি উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এতেই তার আভাষ পাওয়া গেল। তারপর ১৯২৮ সনের প্রথমদিকে সাইমন কমিশনের সদস্যবৃন্দ যখন বোম্বাইতে

উপনীত হলেন, দেশব্যাপী তখন যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল তা-ও ১৯২১ সনের গৌরবময় দিনগুলিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। একদিক থেকে দেখতে গেলে ১৯২৮ সনের অবস্থা ১৯২১ সনের অবস্থার থেকেও অনুকূল ছিল। ১৯২১ সনে ভারতীয় উদারনৈতিকরা সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছেন; কিন্তু ১৯২৮ সনে সক্রিয়ভাবে তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করলেন। এবং সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ব্যাপারে কংগ্রেস ও উদারনৈতিক দলের একটি যুক্ত ফ্রণ্টও গঠিত হলো। ১৯২২ সনে মহাত্মা গান্ধী নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে-আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সাইমন কমিশনের আগমন উপলক্ষে পুনরায় সেই আন্দোলন আরম্ভ করা উচিত ছিল। তৎসত্ত্বেও পুরো দু বছর ধরে সামনে অগ্রসর না হয়ে আমরা শুধু পশ্চাদপসরণ করেছি। ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা কংগ্রেসে প্রায় ১৩০০—৯০০ ভোটে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে করে কংগ্রেসকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস গ্রহণের পথে টেনে নিয়ে এসে ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে দেওয়া হলো। ১৯২৭ সনের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে আমরা যে-পর্যন্ত এগিয়েছিলাম শুধুমাত্র সেই তুলনাতেই নয়, ১৯২০ সনের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরেও যতখানি পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া হয়েছিল কলকাতায় এই প্রস্তাব গৃহীত হবার ফলে তার থেকেও আমরা পিছিয়ে পড়লাম। নাগপুরে স্বরাজ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তার শব্দাবলী সুস্পষ্ট না হওয়ায় এইমর্মে তার অর্থ করা যেতে পারত যে, "স্বাধীনতা"ই ভারতীয় জনসাধারণের লক্ষ্য, "ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস" নয়।

কলকাতা-কংগ্রেসের প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রদানের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে এক বৎসর সময় দেওয়া হলো। কিন্তু ভারতবর্ষকে সেরকম কিছু দেবার কোনও ইচ্ছাই সরকারের ছিল না। সুতরাং ১৯২৯ সন যখন শেষ হতে চললো, অথচ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসলাভের কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না, অবস্থা তখন কংগ্রেসের পক্ষে খানিকটা গুরুতর হয়ে উঠল। কংগ্রেসের লাহোর-অধিবেশনের প্রাক্কালে ১৯২৯ সনের নবেম্বর মাসে কংগ্রেস-নেতারা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, তাতেও কোনও ফলোদয় হলো না। একটি যুক্ত ইস্তাহারে—এটি এখন দিল্লী-ইস্তাহার বলে পরিচিত—নেতৃবৃন্দ জানালেন যে, ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবে বলে যদি আশ্বাস-প্রদান করা হয় তাহলে তাঁরা লণ্ডনের গোলটেবিল-বৈঠকে যোগদান করতে সম্মত আছেন।

সাহসসহকারে যাঁরা ১৯২৮ সনের কলকাতা-কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-প্রস্তাবের বিরোধিতা ও ১৯২৯ সনের নবেম্বর মাসের

দিল্লী-ইস্তাহারের নিন্দা করেছিলেন, আমিও তাঁদের একজন। আমরা আরও বলেছিলাম যে, এই গোলটেবিল-বৈঠক সম্পূর্ণই অর্থহীন; তার কারণ বিবদমান দুই পক্ষের প্রতিনিধিস্থানীয় এবং উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে এই বৈঠক আহ্বান করা হচ্ছে না। বিদেশী সরকারের মনোনীত বহুসংখ্যক নাম-গোত্রহীন ভারতীয় চতুর ব্রিটিশ রাজনীতিকদের ধামা ধরবার জন্য এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবে। শুধু তা-ই নয়, বৈঠকে যদি ভারতবর্ষের অনুকূলেও কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ব্রিটিশ সরকার তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন না। এ-কথাও আমরা বলেছিলাম যে, সরকার কর্তৃক এই বৈঠক আহ্বানের মুখ্য উদ্দেশ্য আর অন্য কিছুই নয়, ভারতীয়দের ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত করে অতঃপর তাঁদের নিজেদের মধ্যে একটা কলহ বাঁধিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ জনসাধারণের হাসির খোরাক জোগানোই হলো সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং আমরা দাবী জানালাম যে, সিন ফিন দল যেমন মিঃ লয়েড জর্জের সৃষ্ট আইরিশ কনভেনশন বর্জন করেছিল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও তেমনি এই গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করা উচিত।

কিন্তু আমাদের সে-দাবী অরণ্যে রোদনের সামিল হয়ে দাঁড়াল। দিনে দিনে সরকারের সঙ্গে যে সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠছিল, নেতৃবৃন্দের সকলেই তখন কোনওক্রমে মান বাঁচিয়ে সেই আসন্ন সংগ্রামকে এড়িয়ে যাবার পথ খুঁজে নিতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সরকার সেরকম কোনও সুযোগ দিলেন না। ফলতঃ, জনমত অধীর হয়ে ওঠায়, ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের লাহোর-অধিবেশনে স্বাধীনতা-প্রস্তাবকে মেনে নেওয়া ছাড়া নেতৃবৃন্দের আর গত্যন্তর রইল না।

কিন্তু যে-"স্বাধীনতা"র অর্থ ব্রিটিশ-শক্তির সঙ্গে সর্বসম্পর্কচ্ছেদ, তার স্বাদও যেমন তিক্ত, তা পরিপাক করাও তেমনি কঠিন। বিগত ন'বৎসরকাল ধরে যে টানাপোড়েন চলছিল, সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীনতা-প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস যখন তার অবসান ঘটাল, মডারেটরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। আমাদের নেতারা তখন তাঁদের অভয় দিতে এগিয়ে গেলেন, এবং তার জন্যে সুন্দর সুন্দর সব শব্দ আর চিত্তাকর্ষক সব শ্লোগান উদ্ভাবন করলেন। বলা হলো যে, স্বাধীনতার অর্থ "পূর্ণ স্বরাজ" (নিজের নিজের সুবিধে অনুযায়ী যে-কেউ এ-কথার যে-কোনো মানে করে নিতে পারেন)। ১৯৩০ সনের প্রথম দিকে মহাত্মা গান্ধী তাঁর বিখ্যাত "এগারো দফা" বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাঁর মতে এইটিই হলো স্বাধীনতার সারমর্ম এবং এরই ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে

আপোষ সম্ভব। এইভাবে নেতৃবৃন্দের নিজেদের কার্যের দ্বারাই লাহোর-কংগ্রেসের স্বাধীনতা-প্রস্তাবের তাৎপর্য ও ফলাফলকে ব্যাহত করা হলো।

লাহোর-কংগ্রেসের পর নেতৃবৃন্দের পক্ষে হাত গুটিয়ে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। ১৯৩০ সনের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবস উদযাপনের সঙ্গেসঙ্গে তাই আন্দোলনও সুরু করা হলো। এপ্রিল মাস নাগাদ দেখা গেল যে, সমগ্র ভারতবর্ষে এক বলিষ্ঠ বিপ্লবজ্বালা ছড়িয়ে পড়েছে (হতে পারে তা অহিংস বিপ্লব)। সংগ্রামের আহ্বানে জনসাধারণের কাছ থেকে যে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল মহাত্মা গান্ধীও তাতে বিস্ময়বোধ করেছিলেন। তিনি তখন এ-কথাও বলেন যে, দু-বছর আগেই এ-আন্দোলন আরম্ভ করা যেতে পারত।

১৯২১ সনের আন্দোলনের মত ১৯৩০ সনের আন্দোলনও সরকারকে হতভম্ব করে দিল। আন্দোলনকে দমন করবার কোনটা সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, বহুদিন ধরে তা-ই তাঁরা তখন স্থির করে উঠতে পারেননি। বহির্বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তখন ছিল ভারতের অনুকূল। সুতরাং ১৯৩১ সনের মার্চ মাসে দিল্লী-চুক্তি (গান্ধী-আরউইন চুক্তি) অনুযায়ী আন্দোলন প্রত্যাহার করে ভুল করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ যদি আপোষই কামনা করে থাকবেন তো সেক্ষেত্রেও তাঁদের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল। আর ছ'মাস কি এক বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে গেলেই সে-সুযোগ উপস্থিত হতো। কিন্তু এবারেও কল্পিত-সত্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হলো; দিল্লী-চুক্তি সম্পাদনকালে বাস্তব তথ্যাদিকে বিচার করে দেখা হয়নি। এমন কথাও আমি বলব যে, ১৯৩১ সনের মার্চ মাসে যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল, আমাদের নেতৃবৃন্দ অধিকতর পরিমাণে রাষ্ট্রনৈতিক ও কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন হলে সেই অবস্থাতেও সরকারের কাছ থেকে অধিকতর সুবিধাজনক শর্ত আদায় করা যেত।

দিল্লী-চুক্তিতে সরকারের সুবিধা হয়েছে,—জনসাধারণের পক্ষে এ-চুক্তি এক বিপর্যয়স্বরূপ। পুনর্বার আন্দোলন আরম্ভ করা হলে কংগ্রেসকে যাতে মারাত্মকভাবে আঘাত হানা সম্ভব হয়, তার জন্য ১৯৩০ ও ১৯৩১ সনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে-কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল সরকার তা অনুধাবন করবার মত সময় লাভ করলেন। সকলেই এখন জানেন যে, ১৯৩২ সনের জানুয়ারী মাসে সরকার কর্তৃক যে সমস্ত অর্ডিন্যান্স জারী করা হয় এবং সারাটা বছর যে-কৌশল অনুযায়ী সরকার কাজ চালিয়ে গিয়েছেন, ১৯৩১ সন শেষ হবার পূর্বেই সযত্নে তাঁরা তার পরিকল্পনা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু

কংগ্রেস সেক্ষেত্রে কী করেছে? সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলায় তখন তীব্র অসন্তোষ বর্তমান; পুনর্বার সংগ্রাম আরম্ভের প্রয়োজনীয়তাও তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দ দেশকে সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তুলবার কোনও চেষ্টাই করেননি। বস্তুতঃ এ-কথা বললেও আমার ভুল হবে না যে, পুনর্বার যাতে সংগ্রাম আরম্ভ করতে না হয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেইজন্যই সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা হয়েছে।

জনসাধারণের আবেগ-উদ্দীপনাকে যাতে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়, দিল্লী-চুক্তিতে তার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জনচেতনা তখন এতবেশী জাগ্রত যে, মিঠে কথায় তা শান্ত হবার নয়। তা যদি না হতো তো নেতৃবৃন্দ যে সেক্ষেত্রে পুনর্বার সংগ্রাম আরম্ভ করবার দায়িত্বকে সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হতেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। ভবিষ্যৎকালের কর্মীদের পক্ষে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, ১৯৩২ সনের আন্দোলন নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিকল্পিত ও সংগঠিত হয়নি, এ-আন্দোলনের মধ্যে তাঁদের জোর করে টেনে আনা হয়েছিল। এবং তা-ই যদি সত্য হয় তো ১৯৩২ সনের জানুয়ারী মাসে যে-গন্ডগোলের মধ্যে তাঁদের টেনে আনা হয়েছিল আজ তাঁরা সেই গন্ডগোলের থেকে অব্যাহতিলাভের জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেই বা আশ্চর্য হবার কী আছে?

১৯৩১ সনের মার্চ মাসের দিল্লী-চুক্তি সম্পর্কে যতই চিন্তা করা যায় ততই ব্যথিত হতে হয় :—

(১) প্রথমতঃ, স্বরাজলাভের মূল প্রশ্নটি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে কোনই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি।

(২) দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের সংগে সম্মিলনের প্রস্তাবকে সেখানে অনুল্লিখিতভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। আমার মতে দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে এ-প্রস্তাব অত্যন্তই ক্ষতিকর।

(৩) তৃতীয়তঃ, নিরস্ত্র দেশবাসীর উপরে গুলী চালাতে যারা অসম্মত হয়েছিল, অহিংসা-মন্ত্রের সর্বোত্তম উপাসক সেই বন্দী গাড়োয়ালী সৈন্যদের মুক্তিপ্রদানের কোনও কথাই সেখানে নেই।

(৪) চতুর্থতঃ, বিনা বিচারে এবং বিনা অভিযোগে অযৌক্তিকভাবে যাঁদের আটক করে রাখা হয়েছে সেই রাজবন্দীদের মুক্তিপ্রদানেরও কোনও ব্যবস্থা সেখানে নেই।

(৫) পঞ্চমতঃ, কয়েক বৎসর ধরে যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা প্রত্যাহার করবারও কোনও কথা সেখানে নেই।

(৬) ষষ্ঠতঃ, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য যাঁরা দণ্ডিত নন, অন্যান্য শ্রেণীর সেইসমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের ব্যবস্থাও সেখানে রাখা হয়নি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গাড়োয়ালী সৈন্য, রাজবন্দী, মীরাট ষড়যন্ত্র-মামলার বন্দী এবং বিপ্লবী বন্দীদের পক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত হবার ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হবার অধিকার হারিয়েছে। এইসমস্ত সাংগ্রামিক সাম্রাজ্য-বাদবিরোধীদের মুখপাত্র হতে অস্বীকৃত হওয়ায় ভারতীয় জনসাধারণের কাছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই পরিচয়টাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এই প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র "সত্যাগ্রহী"দেরই মুখপাত্র ও প্রতিনিধি।

১৯৩১ সনের মার্চ মাসের দিল্লী-চুক্তি যদি একটা বড় রকমের ভুল বলে পরিগণিত হয় তো, ১৯৩৩ সনের মে মাসের আত্মসমর্পণকে একটা বিরাট বিপর্যয় বলে গণ্য করা যায়। ভারতবর্ষের জন্যে একটা নূতন শাসনবিধি নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, আইন অমান্য আন্দোলনকে আরও দৃঢ় করে তুলে রাজনৈতিক কৌশল অনুযায়ী সরকারের উপর তখন যথাসাধ্য চাপ দেওয়া উচিত ছিল। গত তের বৎসরকাল ধরে দেশ যতখানি কাজ এগিয়ে রেখেছে এবং যত যন্ত্রণা ও ত্যাগস্বীকার করেছে, এই সংকটকালে আন্দোলনকে স্থগিত রেখে বস্তুতঃ তার সবটুকুকেই নিষ্ফলা করে দেওয়া হলো। এবং এ-পরিস্থিতির ট্র্যাজেডী হলো এই যে, এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে যাঁরা কার্যকরী প্রতিবাদ জানাতে পারতেন, তাঁরা এখন কারারুদ্ধ। আর যাঁরা কারাগারের বাইরে আছেন, মহাত্মা গান্ধীর ২১ দিবসব্যাপী অনশনের জন্যেই হয়তো তাঁদের পক্ষে সত্যিকারের কোনও প্রতিবাদ জানানো সম্ভব হয়নি।

কিন্তু যে-দান চালা হয়ে গিয়েছে, তা আর ফিরিয়ে নেবার কোনও উপায় নেই। এক মাসের জন্যে আইন অমান্য আন্দোলনকে মুলতুবী রেখে কার্যতঃ বরাবরের জন্যেই একে মুলতুবী রাখা হলো; তার কারণ রাতারাতি গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় কী করা কর্তব্য এবং ভবিষ্যতের জন্যে কী-নীতি ও কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে, সেইটেই এখন আমাদের সমস্যা।

এ-সমস্যার সমাধানের পূর্বে, দুটি প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন :—

(১) যে লক্ষ্য আমরা গ্রহণ করেছি তাতে ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ হওয়া কি সম্ভব?

(২) আপোষবিহীন সাংগ্রামিক কর্মপন্থা গ্রহণের পরিবর্তে যদি মাঝে

মাঝে আপোষ করবার পন্থা গ্রহণ করা হয় ভারতবর্ষ কি তাহলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি জানাতে চাই যে, সেরকম কোনও আপোষ সম্ভব নয়। দুই পক্ষের স্বার্থের মধ্যে একটা সংগতি থাকলে তবেই রাজনৈতিক আপোষ সম্ভব হয়। কিন্তু ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের স্বার্থের মধ্যে তেমন কোনও সংগতি নেই যাতে করে এই দুই দেশের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় হতে পারে। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের থেকেই তা উপলব্ধি করা যাবে :—

(১) দু'দেশের মধ্যে কোনও সামাজিক নৈকট্য নেই।

(২) ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের সংস্কৃতির মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য।

(৩) অর্থনৈতিক বিচারেও বুঝতে পারা যাবে যে, ব্রিটেনের কাছে ভারতবর্ষ শুধু তার কাঁচামাল সরবরাহকারী ও ব্রিটিশ পণ্য ক্রয়কারী একটি দেশ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষও একটি পণ্যোৎপাদনকারী দেশে পরিণত হতে চায়। পণ্যোৎপাদনে স্বয়ং-নির্ভর হওয়া ছাড়াও সে বিদেশে কাঁচামাল ও পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করতে অভিলাষী।

(৪) ভারতবর্ষ এখন ব্রিটেনের পণ্যক্রয়কারী বৃহত্তম দেশসমূহের অন্যতম। শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অগ্রগতি তাই ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী।

(৫) ভারতস্থ সৈন্যবাহিনীতে ও ভারতের শাসনকার্যে এখন তরুণ ইংরেজদের চাকুরির সংস্থান হচ্ছে। সেটা আবার ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতিকূল। ভারতবর্ষ চায় যে এসমস্ত কার্যে ভারতীয়দেরই গ্রহণ করা হোক।

(৬) ভারতবর্ষের নিজেরই যথেষ্ট শক্তি রয়েছে; গ্রেট ব্রিটেনের সাহায্য অথবা পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সমর্থ। এব্যাপারে ডোমিনিয়নসমূহের থেকে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণই পৃথক।

(৭) এত দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটেন ভারতবর্ষের উপরে শোষণ ও প্রভুত্ব চালিয়েছে যে যথার্থই এইরকম একটা আশংকা বর্তমান যে, এই দুই দেশের মধ্যে একটা রাজনৈতিক আপোষ হলে ভারতবর্ষের লোকসান ও ব্রিটেনের লাভ হবে। তাছাড়া দীর্ঘকাল পরাধীন

থাকবার ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা "হীনম্মন্যতা" দেখা দিয়েছে; যতদিন পর্যন্ত না ব্রিটেনের কবল থেকে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করছে ততদিন পর্যন্ত এই "হীনম্মন্যতা"র অবসান হবে না।

(৮) ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশের মর্যাদালাভ করতে চায়। তার নিজস্ব পতাকা, নিজস্ব সৈন্যদল, নিজস্ব নৌ ও প্রতিরক্ষা-বাহিনী থাকবে, এ-ই তার কাম্য। বিভিন্ন স্বাধীন দেশের রাজধানীতে সে তার নিজস্ব রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করতে চায়। এই শক্তি ও প্রাণদায়িনী স্বাধীনতা লাভ করতে না পারলে ভারতবাসীদের পক্ষে কখনও মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হবে না। মনোবল, নীতিধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি—সর্বদিক থেকেই ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতালাভের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষের নবজাগরণের জন্যই এই স্বাধীনতালাভের প্রয়োজন। যে-স্বাধীনতা ভারতবর্ষ আজ চাইছে তা কানাডা অথবা অস্ট্রেলিয়ার "ডোমিনিয়ন হোমরুল" নয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অথবা ফ্রান্সে যে পূর্ণ জাতীয় সার্বভৌমত্ব বর্তমান—তা-ই ভারতবর্ষ চায়।

(৯) যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে বসতিস্থাপনকারী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষা করাও ততদিন তার পক্ষে সম্ভব হবে না। গ্রেট ব্রিটেন বরাবরই ভারতীয়দের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গদের সমর্থন করে এসেছে, ভবিষ্যতেও তা-ই করবে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতালাভ করে তবেই তার পক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যেসমস্ত ভারত-সন্তান বসতিস্থাপন করেছে তাদের প্রতি যাতে সদ্ব্যবহার করা হয় তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এমন কোনও ভিত্তি নেই যার উপরে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের আপোষ সম্ভব। ভারতীয় জনসাধারণের নেতৃবৃন্দ যদি এই মৌল সত্যকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ করেন, সে-ব্যবস্থা দীর্ঘ-স্থায়ী হবে না। ১৯৩১ সনের মার্চ মাসের গান্ধী-আরউইন চুক্তির মত সে-ব্যবস্থাও হবে অত্যন্তই অল্পায়ু। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যেসমস্ত শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে তাতে তার ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা অর্জনই হলো বর্তমান অচলাবস্থার অবসান

ঘটাবার একমাত্র পথ। তার জন্য ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারকে পরাজিত করা দরকার। কীভাবে ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব, সেই কথাই এখন আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি অর্থাৎ কোন্ পন্থা আমাদের অবলম্বন করা উচিত সে সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে, দেশ ইতিমধ্যেই মাঝে মাঝে আপোষ করবার পথ প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশ যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিল তার কারণ হলো এই যে, কংগ্রেস ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা-অর্জনের, এবং স্বাধীনতালাভ না করা পর্যন্ত নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাবার, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মপন্থানির্ধারণের ব্যাপারে মাঝে মাঝে আপোষের চিন্তাকে চিরদিনের জন্য বর্জন করা প্রয়োজন।

অসহযোগ ও আইন-অমান্যের সাহায্যে দেশের শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়ে কংগ্রেস ভারতবর্ষের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের আশা করেছিল। এ-ব্যাপারে আমাদের ব্যর্থতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার; তাহলেই ভবিষ্যতে আমাদের পক্ষে অধিকতর সাফল্যলাভ সম্ভব হবে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের অবস্থাকে আজ বিদ্রোহীভাবাপন্ন একটি ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত অস্ত্রবলে বলীয়ান এক সুদৃঢ় দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু সে-দুর্গ যতই শক্তিশালী হোক, আপন অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনেই তার চতুস্পার্শ্বস্থ ও নিকটবর্তী স্থানসমূহের অসামরিক অধিবাসীদের বন্ধুত্বলাভ দরকার। চতুঃস্পার্শ্বস্থ অধিবাসীরাও যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিকটবর্তী স্থানসমূহের জনসাধারণ দুর্গদখলের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে-দুর্গের আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। ব্রিটিশ সরকারের দখলভুক্ত এই দুর্গটিকে জয় করাই হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। এ-ব্যাপারে কংগ্রেস দুর্গের চতুঃস্পার্শ্বস্থ ও নিকটবর্তী স্থানসমূহের অধিবাসীদের সহানুভূতি ও সমর্থনলাভ করেছে। ভারতীয়দের দিক থেকে অভিযান-পরিচালনার এটি হলো প্রথম পর্যায়। অভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদুটির মধ্যে যে-কোনও একটি অথবা দুটি ব্যবস্থাই অবলম্বন করা যেতে পারে :—

(১) দুর্গটির পূর্ণ অর্থনৈতিক অবরোধ। তাতে করে দুর্গ-দখলকারী সৈন্যরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হব।

(২) অস্ত্রবলের সাহায্যে দুর্গজয়ের চেষ্টা।

যুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই উভয় পন্থাই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

সামরিক সাফল্যের বিচারে গত মহাযুদ্ধে জার্মাণীই ছিল বিজয়ীপক্ষ; কিন্তু মিত্রশক্তির অর্থনৈতিক অবরোধের দরুণ তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। সমুদ্রের উপরে এবং যেসমস্ত পথ জার্মাণীর দিকে গিয়েছে তার উপরে দখল ছিল বলেই মিত্রশক্তির পক্ষে অর্থনৈতিক অবরোধ-ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব হয়েছিল।

অস্ত্রবলের সাহায্যে ভারতবর্ষে শত্রুদুর্গজয়ের চেষ্টা করা হয়নি। তার কারণ কংগ্রেসের নীতি অহিংসপন্থাশ্রয়ী। মোটামুটিভাবে কংগ্রেস অর্থনৈতিক অবরোধের জন্য চেষ্টা করেছে বটে, তবে তিনটি কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয় :—

(ক) বাইরের যে-সমস্ত পথ ভারতাভিমুখী, তা সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন।

(খ) ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ সংগঠন-ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায়, সমুদ্র-বন্দর থেকে যে-সমস্ত পথ দেশাভ্যন্তরে এবং যে-সমস্ত পথ দেশের একাংশ থেকে অন্য অংশে গিয়েছে তার উপরে কংগ্রেসের দখল নেই, সে-সমস্ত পথ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

(গ) যে রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থার উপরে ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, গুরুতরভাবে কখনও তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়নি। অধিকাংশ প্রদেশেই ঘাটতি বর্তমান সন্দেহ নেই; তবে করভার বৃদ্ধি করে অথবা ঋণ সংগ্রহ করে সরকার তা পুষিয়ে নিতে পেরেছেন।

সর্বসময়েই মনে রাখা দরকার যে, নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহের যে-কোনও একটি অথবা সব কটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তবেই জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশী সরকারকে পঙ্গু করে দেওয়া সম্ভব :—

(১) কর এবং রাজস্ব-সংগ্রহ বন্ধ করে দেওয়া।

(২) এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে করে সঙ্কটকালে অন্যান্য অঞ্চল থেকে সরকারের কাছে অর্থনৈতিক অথবা সামরিক সাহায্য এসে পৌঁছতে না পারে।

(৩) সরকার আন্দোলন-দমনের আদেশ দিলেও সে-আদেশ যাতে পালন করা না হয় তার জন্য ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বর্তমান সমর্থকদের অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন।

(৪) অস্ত্রবলের সাহায্যে ক্ষমতা অধিকার করবার জন্য বাস্তব প্রচেষ্টার আশ্রয় নেওয়া।

শেষোক্ত ব্যবস্থাটির কথা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে; তার কারণ কংগ্রেস অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী। তা সত্ত্বেও যদি আমরা নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ

অবলম্বন করতে পারি তাহলে বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়া ও আমাদের দাবীর কাছে তাকে নতিস্বীকারে বাধ্য করা সম্ভব :—

(১) কর ও রাজস্ব-সংগ্রহ বন্ধ করে দেওয়া।

(২) শ্রমিক ও কিষাণ-সংগঠনের মাধ্যমে সঙ্কটকালে সরকারের কাছে কোনও সাহায্য পেঁৗছতে না দেওয়া।

(৩) অধিকতর কার্যকরী প্রচার-ব্যবস্থার সাহায্যে সরকার-সমর্থকদের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন করা।

এই তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেই সরকারের শাসনযন্ত্রটি বিকল করে দেওয়া সম্ভব। প্রথমতঃ, শাসনকার্যের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা তাঁরা সংগ্রহ করতে পারবেন না। দ্বিতীয়তঃ, যে-আদেশ তাঁরা প্রদান করবেন, তাঁদের নিজেদের অফিসাররাই তা পালন করবেন না। এবং তৃতীয়তঃ, অন্যান্য মহলের থেকে প্রেরিত সাহায্য সরকারের কাছে গিয়ে পেঁৗছবে না।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে সাফল্য অর্জনের কোনও রাজপথ নেই। জয়লাভ করতে হলে আংশিক অথবা পুরোপুরিভাবে উল্লিখিত ব্যবস্থা তিনটি অবলম্বন করতে হবে। উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলিকে সন্তোষজনকভাবে কার্যকরী না করতে পারার জন্যই কংগ্রেসকে ব্যর্থতাবরণ করতে হয়েছে। সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গত কয়েক বছরে শান্তিপূর্ণভাবে যে-সমস্ত সভা-শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে একটা দুর্বার প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ নেই এবং সরকারেরও তাতে খানিকটা উদ্বেগের কারণ ঘটেছে। কিন্তু সরকারের অস্তিত্বকে তা এখনও সঙ্কটাপন্ন করে তুলতে পারেনি। আমাদের সমস্ত বিক্ষোভ সত্ত্বেও এবং ১৯৩২ সনের জানুয়ারী মাস থেকে এপর্যন্ত সত্তর হাজার লোক কারাগারে প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত সরকার দাবী করতে পারেন যে—

(১) তাঁদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পূর্ণ আনুগত্য বর্তমান।

(২) তাঁদের পুলিশ-বাহিনীর মধ্যে পূর্ণ আনুগত্য বর্তমান।

(৩) অসামরিক শাসনব্যবস্থা (রাজস্ব ও করসংগ্রহ, আদালত ও কারাগার পরিচালনা ইত্যাদি) এখনও অব্যাহত।

(৪) সরকারী কর্মচারিবৃন্দ ও তাঁদের সমর্থকদের ধনপ্রাণ এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এবং এ-অহঙ্কারও সরকার এখনো পর্যন্ত করতে পারেন যে, ভারতীয় জনসাধারণ আজ নিষ্ক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করলেও তাঁদের কিছুই যায়-আসে

না। যতক্ষণ পর্যন্ত না জনসাধারণ অস্ত্রবল অথবা কার্যকরী অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমে সরকার ও তাঁর সমর্থকদের সক্রিয়ভাবে বিপদগ্রস্ত করে তুলছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন সত্ত্বেও সরকার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবেন।

গত দশ বছরে সারা ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব গণ-জাগরণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে আর সেই শান্ত আত্মতুষ্ট মনোভাব নেই। সমগ্র দেশ আজ এক নূতন প্রাণ-চেতনায় স্পন্দিত হচ্ছে, সমগ্র দেশ আজ স্বাধীনতা চাইছে। সরকারী ভ্রূকুটি, কারাদণ্ড আর ব্যাটন-চার্জের ভয় আজ তিরোহিত। ব্রিটিশ-শক্তির মর্যাদা আজ অত্যন্তই হ্রাস পেয়েছে। ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি শুভেচ্ছাসম্পন্ন হওয়ার কোনও প্রশ্নই আর ওঠে না। ব্রিটিশ-শাসনের নীতিগত ভিত্তিটিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে; একমাত্র পশুবলের উপরেই তা এখন নির্ভরশীল। বিশ্ববাসীর দৃষ্টিকেও ভারত আজ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু তা-সত্ত্বেও এই কঠিন সত্যকে মেনে নিতে হবে যে, "স্বাধীন ভারতের" স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করা এখনো সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি-প্রকাশিত শ্বেতপত্রে ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের যে-মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, প্রকৃত ক্ষমতার সামান্যতম অংশ ছাড়তেও তাঁরা প্রস্তুত নন। ব্রিটিশ সরকার মনে করেন যে, ভারতীয় জনসাধারণের দাবীকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করবার মতো শক্তি তাঁদের আছে। আমাদের প্রতিরোধ করবার মতো শক্তি যদি তাঁদের থাকে তো তাতে করে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ১৯২০ সন থেকে ভারতীয় জনসাধারণ যে কঠোর পরিশ্রম করে এসেছে তা আমাদের লক্ষ্যবস্তু "স্বরাজের" নিকটবর্তী করে দিতে পারেনি।

ভারতবর্ষকে তাই বৃহত্তর এবং কঠোরতর আর-এক সংগ্রাম আরম্ভের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। সে-সংগ্রামের মানসিক ও বাস্তব প্রস্তুতির ভিত্তি বিজ্ঞানবুদ্ধিসম্মত হওয়া চাই; তা যেন বাস্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মানসিক প্রস্তুতির জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করা প্রয়োজনঃ—

(ক) ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থার বিচারে ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের শক্তি ও দুর্বলতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

(খ) ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসনের অবস্থার বিচারে ভারতীয় জনসাধারণের শক্তি ও দুর্বলতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

(গ) পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

(ঘ) অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, এবং পৃথিবীতে স্বাধীনতার সামগ্রিক ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস বিচার।

যে-কাজে আমরা হাত দিতে যাচ্ছি তা যে কতো বিরাট, এই বিচার-বিশ্লেষণ সমাপ্ত হলে তবেই তা আমরা উপলব্ধি করতে পারব, তার আগে নয়।

ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার জন্য সর্বপ্রকার যন্ত্রণা ও ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত দৃঢ়সংকল্প নরনারীদের নিয়ে একটি দল গঠন করাই হলো আমাদের পরবর্তী প্রয়োজন। ভারতবর্ষ মুক্তি অর্জন করতে এবং পুনর্বার স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা-লাভ করতে সক্ষম হবে কিনা তা নির্ভর করছে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সে সক্ষম কিনা তারই উপরে। প্রয়োজনীয় নেতৃত্বসৃষ্টি-ক্ষমতার মধ্য দিয়েই তার প্রাণশক্তি ও "স্বরাজ"লাভের যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

তৎপরবর্তী প্রয়োজন হলো ভবিষ্যতের জন্য একটি বিজ্ঞানবুদ্ধিসম্মত কর্মপন্থা ও কার্যসূচী নির্ধারণ। বর্তমান কাল থেকে সুরু করে ক্ষমতা-অধিকার করা পর্যন্ত আমাদের কর্মপন্থা কী হবে সেটা স্থির করে ফেলতে হবে, এবং যথাসাধ্য বিস্তারিতভাবে তার একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। ইতিহাস ও মানবপ্রকৃতিগত তথ্যাদির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাস্তব ও বিজ্ঞান-বুদ্ধিসম্মত ভিত্তির উপরেই যেন আমাদের ভবিষ্যৎ আন্দোলন নির্ভরশীল হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন শত হলেও একটা বাস্তব ব্যাপার; অথচ ইতিপূর্বে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে বড় বেশী "অন্তঃপ্রেরণা" ও অবাস্তব অনুভূতির উপর নির্ভর করা হয়েছে।

শুধু ক্ষমতা অধিকারের কর্মপন্থা নির্ধারণই নয়, ভারতে যে নূতন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হবে তার জন্যেও আমাদের একটি কার্যসূচী স্থির করবার প্রয়োজন হবে। কোনও কিছুকেই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। যে-সমস্ত নরনারী গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন, নূতন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্বও তাঁদেরই গ্রহণ করতে হবে। সংগ্রামোত্তর কালের নেতৃত্বগ্রহণের জন্যও যদি আমাদের নেতৃবৃন্দ প্রস্তুত না থাকেন, তাহলে ক্ষমতালাভের পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার, এবং অষ্টাদশ শতকে ফরাসী-বিপ্লবকালে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল ভারতবর্ষেও তার পুনরাবৃত্তি হবার যথেষ্টই আশঙ্কা রয়েছে। সংগ্রামকালে নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর মনে যে আশা-

আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবেন তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রয়োজনে সংগ্রাম-কালীন নেতৃবৃন্দকেই যে সংগ্রামোত্তর কালের সংস্কার-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হবে, পরিষ্কারভাবেই তা বলে রাখা দরকার। নবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর যতক্ষণ পর্যন্ত না পরবর্তীকালের নূতন একদল নরনারীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারা যাচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা দেশের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নেতৃবৃন্দের কাজ শেষ হবে না।

ভবিষ্যতের দলটিকে ভারতীয় জনসাধারণের পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। তার কারণ গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে পরবর্তী পর্যায়ের কঠোর সংগ্রামের জন্য যে নীতি, কার্যসূচী, পন্থা ও কৌশলের প্রয়োজন হবে, নেতৃবৃন্দ যে তা অবলম্বন করতে পারবেন এমন সম্ভাবনা নেই।

এক যুগের নেতৃবৃন্দকে পরবর্তী যুগেও নেতৃপদে অধিষ্ঠিত থাকতে ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না; এরকম দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। তাতে তাঁদের অগৌরবের কিছু নেই। সময়ই উপযুক্ত মানুষ তৈরি করে নেয়। ভারতবর্ষেও তার ব্যত্যয় ঘটবে না।

গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে "জাতীয়" সংগ্রামে এই নূতন দলকে যোদ্ধা ও নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে; নবভারত গঠনের দায়িত্বও তাঁদেরই। তাঁদেরই সংগ্রামোত্তর সামাজিক পুনর্গঠনের ভার গ্রহণ করতে হবে। ভারত-বর্ষের আন্দোলন হবে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ের সংগ্রাম হবে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে "জাতীয়" সংগ্রাম; তবে ভারতীয় শ্রমিকসমাজের প্রতিনিধিত্ব-মূলক "গণ-দলে"র হাতেই তার নেতৃত্বভার ন্যস্ত থাকবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে একই দলের নেতৃত্বে আন্তঃশ্রেণী সংগ্রাম চলবে। আমাদের দেশে যাতে সম্পূর্ণ সাম্য (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য সংগ্রামের এই পর্যায়ে সর্বপ্রকার বিশেষ-সুবিধা, পার্থক্য ও কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটাতে হবে। আসন্ন ভবিষ্যতেই বিশ্ব-ইতিহাসে ভারতবর্ষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। সকলেই আমরা জানি যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড তার নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা-সংক্রান্ত মতবাদের মাধ্যমে বিশ্ব-সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। অনুরূপভাবে ফ্রান্সও অষ্টাদশ শতকে তার "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা"র বাণী প্রচার করে বিশ্ব-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। জার্মানীও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ববাসীকে তার মার্ক্সীয় মতবাদ উপঢৌকন দেয়। বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া

তার সর্বহারার বিপ্লব, শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বিশ্ব-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

আমাদের ব্রিটিশ বন্ধুরা মাঝে মাঝে বলেন যে, ব্রিটিশ জনসাধারণ খোলা-মনেই ভারতীয় সমস্যাটিকে বিচার করে দেখতে প্রস্তুত, এবং প্রচারকার্যের সাহায্যে তাদের সহানুভূতি অর্জন করতে পারলে আমাদের যথেষ্টই লাভ হবে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ব্রিটিশ জনসাধারণ খোলামনে ভারতীয়-সমস্যাটিকে বিচার করে দেখতে প্রস্তুত বলে আমি মনে করি না। সেটা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে একইসঙ্গে শাসন ও শোষণ চলছে। জনকয়েকমাত্র ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও মূলধনবিনিয়োগকারী সে-শোষণ চালাচ্ছে না। সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনই ভারতবর্ষের উপরে সেই শোষণ চালাচ্ছে। ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ মূলধন নিয়োগ করা হয়েছে, তা যে শুধু সমাজের উপরকার শ্রেণী থেকে এসেছে তা নয়; মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং খুব সম্ভবতঃ কিছু পরিমাণে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীরও তার মধ্যে অংশ রয়েছে। ভারতবর্ষে বয়ন-শিল্পের উন্নতি ঘটলে ল্যাঙ্কাশায়ারের তাতে ক্ষতি ঘটবে। গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক-শ্রেণীরও তাতে স্বার্থে আঘাত লাগবে। এই কারণেই গ্রেট ব্রিটেনের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভারতীয়-সমস্যা নিয়ে মতদ্বৈধ নেই। এই কারণেই লণ্ডনে শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে পাশবিক দমননীতি ও নিগ্রহ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি জানি যে, শ্রমিক দলে এমন কিছু কিছু সদস্য রয়েছেন যাঁদের মনে স্বার্থবুদ্ধির স্থান নেই; ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায়াচরণে তাঁরা আন্তরিকভাবেই উৎসুক। কিন্তু যতই আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি না কেন, এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক যতই না কেন বন্ধুত্বপূর্ণ হোক, এ-কথা অনস্বীকার্য যে, দলের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবার মতো ক্ষমতা তাঁদের নেই। এবং অতীত অভিজ্ঞতার থেকেই আমরা বলতে পারি যে, ডাউনিং স্ট্রীটে সরকারের পরিবর্তন হলেও ভারতীয় পরিস্থিতির তাতে উন্নতি আশা করা যায় না।

ভারতবর্ষে রাজনীতি ও অর্থনীতি পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে,—এবং ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের উদ্দেশ্য শুধু রাজনৈতিক প্রভুত্ব নয়, অর্থনৈতিক শোষণও। তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মূলতঃ অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা দরকার। ভারতবর্ষ যতদিন পরাধীন থাকবে, কোটি কোটি বুভুক্ষু দেশবাসীর অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য ও শরীরগঠন সমস্যারও ততদিন কোনও সমাধান করতে পারা যাবে না। ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ করবার পূর্বে তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ও শিল্পপ্রসারের কথা চিন্তা করাটা ঘোড়ার সামনে গাড়ী যুতে দেবারই সামিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসনের অবসান ঘটবার পর সেখানকার অভ্যন্তরীণ অবস্থা কী দাঁড়াবে, প্রায়ই আমাদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ব্রিটিশ প্রচার-কার্যের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর মনে এই ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ দেশটা অভ্যন্তরীণ কলহবিবাদে পরিপূর্ণ, ইংল্যান্ড সেখানে তার আপন শক্তি-বলে শান্তি বজায় রেখেছে। অন্যান্য সমস্ত দেশে যেমন অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিরোধ বর্তমান, ভারতবর্ষেও একসময়ে অভ্যন্তরীণ বিবাদবিরোধ ছিল। কিন্তু জনসাধারণই সেই বিবাদের সমাধান করে নিয়েছে। এই কারণেই সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে বহু শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পেরেছে, ইতিহাস-পাঠেই তা জানতে পারা যায়। অশোকের সাম্রাজ্য তার অন্যতম। তাঁর সেই সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় সমগ্র দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু আজকের বিবাদবিরোধ স্থায়ী ধরণের। তৃতীয় পক্ষের অনুচররাই কৃত্রিম উপায়ে সেই বিবাদবিরোধের সৃষ্টি করছে। এ বিষয়ে আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে যতদিন ব্রিটিশ-শাসন বজায় থাকছে, ভারতবাসীদের মধ্যে ততদিন প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কারুর কাছ থেকেই আমরা কিছু আশা করতে পারি না। তৎসত্ত্বেও আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক প্রচারকার্যের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সে-প্রচারের দুটি দিক থাকবে,—সত্য ঘোষণা ও মিথ্যাখণ্ডন। জ্ঞাতসারেই হোক্ আর অজ্ঞাতসারেই হোক্, ব্রিটিশ সরকারের অনুচররা ভারতবর্ষের সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বে যেসমস্ত মিথ্যা কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে, সেগুলোকে আমাদের খণ্ডন করতে হবে। সেইসঙ্গে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপটি, এবং ভারতবর্ষের অভিযোগসমূহকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। বলা বাহুল্য যে, লণ্ডন হবে এই আন্তর্জাতিক প্রচারকার্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে কিছুকাল আগেও আন্তর্জাতিক প্রচার-কার্যের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেননি, সেটা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। আশা করা যায়, দেশবাসী ক্রমশই আন্তর্জাতিক প্রচার-কার্যের মূল্য বুঝতে পারবেন।

ইংরেজের প্রচারকৌশলকে আমি যতখানি প্রশংসা করি, এমন বোধ হয় আর তাদের অন্য কিছুকে নয়। ইংরেজরা জন্মকাল থেকেই প্রচারবাদী। হাউইটজার কামানের চাইতেও প্রচারকার্যকে তারা অধিকতর শক্তিশালী অস্ত্র বলে গণ্য করে। ইউরোপের আর-একটি দেশ ব্রিটেনের কাছ থেকে এই শিক্ষা

আয়ত্ত করেছে। সে দেশ রাশিয়া। ব্রিটেন যে রাশিয়াকে অপছন্দ করে, এবং তার (ব্রিটেনের) সাফল্যের গুহ্য কারণটি জেনে ফেলায় রাশিয়াকে যে সে ভয়ও করে, তাতে তাই অবাক্ হবার কিছু নেই।

ব্রিটিশ-শক্তির অনুচররা বহির্বিশ্বে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে এত বেশী মারাত্মক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তার অভিযোগগুলিকে যদি আমরা বিবৃত করতে সক্ষম হই তো তৎক্ষণাৎ আমরা বহুল পরিমাণে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি অর্জন করতে পারব। যে-যে বিষয়ে সমগ্র বিশ্বে সক্রিয় প্রচারকার্যের প্রয়োজন বর্তমান, তার কয়েকটির কথা আমি এখানে উল্লেখ করছিঃ—

(১) ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার, এবং দীর্ঘ-মেয়াদের রাজনৈতিক বন্দীদের অস্বাস্থ্যকর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রেরণ। সম্প্রতি সেখানে অনশন-ধর্মঘটের ফলে দুজন বন্দীর মৃত্যু হয়েছে।

(২) ছাড়পত্র প্রদানের ব্যাপারে ভারতবাসীদের প্রতি সরকারের প্রতিশোধ-পরায়ণ মনোবৃত্তি। (ভারতবর্ষের বাইরে কেউ জানেন না যে, এক-দিকে ভারতবর্ষের বাইরে যেতে ইচ্ছুক বহু ভারতবাসীকে যেমন ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি, অন্যদিকে আবার ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক বহু প্রবাসী ভারতীয়ের ছাড়পত্রের আবেদন না-মঞ্জুর করা হয়েছে।)

(৩) অসহায় গ্রামবাসীদের ভিতরে সন্ত্রাসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, বিমান থেকে নিয়মিতভাবে বোমাবর্ষণ।

(৪) ভারতশাসনকালে গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ শিল্প-সমূহের কণ্ঠরোধ। জাহাজ-নির্মাণ শিল্পও তার অন্যতম।

(৫) বাণিজ্যগত সাম্রাজ্যিক সুবিধার পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতীয় জনসাধারণের ব্যাপক বিরোধিতা। অটোয়া-চুক্তিরও সেখানে বিরোধিতা করা হয়েছে। (বিশ্ববাসীকে জানানো প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ অটোয়া-চুক্তিকে কখনোই মেনে নেয়নি; জোর করে তার উপরে এটাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।)

(৬) ভারতবর্ষ চায় যে, তার শিশু-শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক্; এ-কারণে শুল্ক-সুবিধা প্রদানের পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতীয় জনসাধারণের বিরোধিতা।

(৭) ইংল্যাণ্ড কর্তৃক একতরফা যে-ভাবে বিনিময়-হার নির্ধারণ করা হয়েছে, তা ভারতীয় স্বার্থের প্রতিকূল। নিছক বিনিময়-হারের দৌলতেই গ্রেট ব্রিটেন যে কী ভাবে ভারতবর্ষের বহু কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছে, বিশ্ববাসীর তা জানা প্রয়োজন।

(৮) বিশ্ববাসীকে এ-কথাও জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষের উপরে এক বিপুলপরিমাণ সরকারী-ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এ-সম্পর্কে কিছুমাত্র দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত নন। ১৯২২ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গয়া-অধিবেশনে সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, এই সরকারী-ঋণের কোনওপ্রকার দায়িত্বই তাঁরা স্বীকার করবেন না। সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষের উপকারার্থে এই ঋণ গ্রহণ করা হয়নি, গ্রহণ করা হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যাপারেও ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে কিছু প্রচারকার্য চালাবার যথেষ্টই গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্তমান। গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অভিযোগসমূহ বর্ণনা করে এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে ভারতবর্ষের প্রকৃত অভিমত জানিয়ে সযত্নে একটি স্মারকলিপি রচনা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের প্রত্যেক সদস্যের কাছে তা পেশ করা প্রয়োজন।

নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন সম্পর্কেও ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, এ-ব্যাপারে ব্রিটেনের আন্তরিকতা কতখানি, ভারতবর্ষেই তার প্রমাণ হয়ে যাওয়া উচিত। যে দেশের জনসাধারণকে প্রায় ৮০ বৎসরকাল ধরে নিরস্ত্র করে রাখা হয়েছে, যে-দেশের অধিবাসীদের সম্পূর্ণ-রূপে শক্তিহীন করে রাখা হয়েছে, সে-দেশের কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ সামরিক ব্যয় খাতে বরাদ্দ করবার যৌক্তিকতা কোথায়?

এতদ্‌সংক্রান্ত সর্বপ্রকার তথ্য যদি বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরা হয়, ইংল্যাণ্ডের যে তাহলে অভিযোগ খণ্ডনের আর কোনও উপায় থাকবে না, সে বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চিত।

যখনই কোনও বিশ্ব-কংগ্রেসে অথবা বিশ্ব-সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ থেকে সচরাচর তখন এই অজুহাত দেখানো হয় যে, ভারতবর্ষের প্রশ্নটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা ঘরোয়া ব্যাপার। ভারত-বাসীদের আর তা মেনে নেওয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষ যদি লীগ অব্ নেশন্‌স্‌য়ের সদস্য হতে পারে তো সেক্ষেত্রে তাকে 'নেশন্' বলেই গণ্য করতে

হবে এবং একটা নেশনের সর্বপ্রকার অধিকার ও সুবিধাও সেক্ষেত্রে তার বর্তমান। আমি জানি যে, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার জন্য আমাদের কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু আর দেরী না করে সে-চেষ্টা আরম্ভ করা কর্তব্য।

শ্বেতপত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন নেই; ততখানি গুরুত্ব তাকে দেওয়া যেতে পারে না। আমি শুধু এইটুকুমাত্র বলতে চাই যে, ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের সঙ্গে সম্মিলিত হবার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা একটা অসম্ভব প্রস্তাব এবং আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্যই সমগ্র ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য, ভারতীয় জনসাধারণের একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই আমরা চেষ্টা করে যাব। কিন্তু তাই বলে মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড অথবা লর্ড স্যাঙ্কির খেয়ালখুশী চরিতার্থ করবার জন্য আইন-সভাসমূহে এখনকার সরকারী ব্লকের জায়গায় নৃপতিবৃন্দকে এনে বসাবার এই প্রস্তাব আমরা মেনে নিতে পারি না। তা ছাড়া একই মুখে "স্বাধীনতা" ও "রক্ষাকবচে"র কথা বলা অর্থহীন। স্বাধীনতা যদি পেতে হয় তো রক্ষাকবচের কথা চিন্তা করা চলবে না, কেননা স্বাধীনতাই আমাদের রক্ষাকবচ। "ভারতবর্ষের স্বার্থে রক্ষাকবচ-ব্যবস্থা"র কথা বলা আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র।

কবে আমরা এমন শাসনতন্ত্র লাভ করব, জনসাধারণের হাতে যাতে বেশ-খানিকটা ক্ষমতা দেওয়া হবে, আজ তা বলা সম্ভব নয়। তবে সে ক্ষমতা যখন আমরা অর্জন করব, জনসাধারণ যে তখন অস্ত্রবহনের অধিকার চাইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তারা তখন সমগ্র বিশ্ব, বিশেষতঃ ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশে বলবে, "অস্ত্র পরিহার করো, নয়তো আমরা অস্ত্রধারণ করব।" দুঃখ-জর্জর এই পৃথিবীতে স্বেচ্ছায় অস্ত্র-পরিহার যেমন একটা আশীর্বাদস্বরূপ, বিজিত একটা জাতিকে প্রায় ৮০ বৎসরকাল ধরে বলপূর্বক নিরস্ত্র রাখাও তেমনি মারাত্মক একটা অভিশাপ। ভারতবর্ষে আমরা সেই অভিশাপই প্রত্যক্ষ করছি। যে-শান্তির কথা ব্রিটেন গর্বভরে প্রচার করে বেড়ায় তা স্বাস্থ্যসবল জীবনের শান্তি নয়, তা কবরের শান্তিমাত্র।

সাফল্য অর্জনের জন্য নূতন দলটিকে যে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে, ইতিপূর্বে আমি তার উল্লেখ করেছি। রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার, এবং নূতন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেই ক্ষমতার যথাযথভাবে প্রয়োগ যাতে সম্ভব হয় তার জন্য এখন থেকেই দেশবাসীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করবার পরে জাতীয় জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য মৌলিক চিন্তাধারা ও নূতন নূতন পরীক্ষা-

নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে। সেই পথেই সাফল্যলাভ সম্ভব। বিগত যুগীয় এবং অতীত কালের শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা এ-ব্যাপারে বিশেষ-কিছু কাজে আসবে না। ভারতবর্ষে আজ যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমান, স্বাধীন ভারতে তার আমূল পরিবর্তন ঘটবে। শিল্প, কৃষি, ভূমি-ব্যবস্থা, অর্থ, বিনিময়, মুদ্রা-ব্যবস্থা, শিক্ষা, কারা-ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি সর্ববিষয়েই নূতন নূতন পন্থানির্ধারণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা জানি যে, দেশের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সোভিয়েট রাশিয়ায় জাতীয় (অথবা রাজনৈতিক) অর্থনীতির একটি নূতন পরিকল্পনা স্থিরীকৃত হয়েছে। ভারতবর্ষেও সেই একই ব্যাপার ঘটবে। আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা-সমূহের সমাধানকার্যে পিগো এবং মার্শালের মতবাদ তেমন-কিছু সাহায্যে লাগবে না।

ইতিমধ্যেই ইউরোপে এবং ইংল্যাণ্ডে জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই পুরাতন মতবাদের কার্যকারিতায় সংশয় দেখা দিয়েছে এবং পুরাতন মতবাদের স্থলে নূতন নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সিলভিয়ো গেসেলের উদ্ভাবিত "ফ্রী মানি" ব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। জার্মানীর ছোট একটা অংশে এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা হয়েছে, এবং দেখা গেছে যে, ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণই সন্তোষজনক। ভারতবর্ষেও এই একই ব্যাপার ঘটবে। স্বাধীন ভারতে পুঁজিবাদী, জমিদার এবং শ্রেণীবিভাগের অস্তিত্ব থাকবে না। স্বাধীন ভারতবর্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে। আজকের ভারতবর্ষ যে-সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন, স্বাধীন ভারতবর্ষে সে-সমস্ত সমস্যার অস্তিত্ব থাকবে না। তার সমস্যা হবে ভিন্ন প্রকৃতির। এখন থেকেই তাই কিছু কিছু লোককে এমনভাবে গড়ে তোলা দরকার যাতে তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে পারেন এবং স্বাধীন ভারতবর্ষকে যে-সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, এখন থেকেই তার সমাধানের উপায় ভেবে রাখতে সক্ষম হন।

কোনও আন্দোলনই সুরুতে বড়ো থাকে না, ধীরে ধীরে সে বিরাট হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষেও তা-ই হবে। আমাদের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে যন্ত্রণা ও ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন ঘটবে; সর্বপ্রকার যন্ত্রণা ও ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত—এমন কিছু নরনারীকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই হলো আমাদের প্রথম কাজ। তাঁরা হবেন সর্বসময়ের কর্মী, মুক্তিমন্ত্রের সাধক। ব্যর্থতায় হতোদ্যম কিংবা বাধাবিঘ্নে হৃতশক্তি হলে তাঁদের চলবে না; আদর্শসিদ্ধির জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের সংগ্রাম করতে হবে।

"নৈতিক বলে বলীয়ান" এই নরনারীদের অতঃপর বুদ্ধিগত উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে; তবেই তাঁরা তাঁদের দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। একইধরণের অসুবিধাসত্ত্বেও অন্যান্য দেশে কীভাবে একইধরণের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে তা বুঝবার জন্য তাঁদেরকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস বিচার করে দেখতে হবে। একইসঙ্গে অন্যান্য যুগে অন্যান্য দেশে কীভাবে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থানপতন ঘটেছে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তা-ও তাঁদের বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। এর থেকে তাঁরা যে জ্ঞান অর্জন করবেন সেই জ্ঞানবলে বলীয়ান হয়ে অতঃপর তাঁদেরকে ভারতবাসীদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শক্তি ও দুর্বলতা এবং ব্রিটিশ সরকারের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবাসীদের শক্তি এবং দুর্বলতার বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

ক্ষমতা অধিকারের জন্য কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং ক্ষমতা অধিকারান্তে নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর কোন্ কর্ম-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা প্রয়োজন, বুদ্ধিগত শিক্ষা সমাপ্ত হলেই সে-সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট একটা ধারণা হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আদর্শের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ দৃঢ়সংকল্প এমন কিছুসংখ্যক নরনারীকে নিয়ে আমাদের একটি দলগঠন প্রয়োজন যাঁরা উপযুক্ত বুদ্ধিগত শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং ক্ষমতা অধিকারের পূর্বে ও পরে কী কী দায়িত্বপালনের প্রয়োজন হবে সে সম্পর্কে যাঁদের মনে সুস্পষ্ট একটা ধারণা বর্তমান।

এই দলটিকেই বৈদেশিক শাসনের কবল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে হবে। এই দলটিকে ভারতবর্ষে একটি নূতন, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র-স্থাপনা করতে হবে। এই দলটিকেই সংগ্রামোত্তর কালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন-কার্যের সমগ্র পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হবার জন্য সর্বপ্রকারে প্রস্তুত এক নূতন সমাজসৃষ্টির দায়িত্ব এই দলেরই। সর্বোপরি, এই দলটিকেই বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষকে তার গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এ-দলের নাম হোক্ সাম্যবাদী সঙ্ঘ। এটি হবে একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল সর্বভারতীয় দল। সমাজের সর্বস্তরের মধ্যেই এ-দলের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কিষাণ-সংস্থা, বিভিন্ন নারী-সংস্থা, যুব-প্রতিষ্ঠান, ছাত্র-প্রতিষ্ঠান, অনুন্নত শ্রেণী-সংস্থা, এবং প্রয়োজনবোধে মহত্তর স্বার্থের কারণে বিভিন্ন

উপদলীয় অথবা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানেও এই দলের প্রতিনিধি থাকবে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্র ও স্থানে কর্মনিরত শাখাসমূহকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে রাখতে হবে।

অন্য কোনও দল যদি সামগ্রিক অথবা আংশিকভাবে এই একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যায়, তবে এই দল তার সঙ্গে একযোগে কাজ করবে। কোনও ব্যক্তিবিশেষ অথবা দলের প্রতি এই দলটি বিদ্বেষভাবাপন্ন হবে না বটে, তবে ইতিহাসের যে একটি বিশেষ ভূমিকার কথা উপরে বিবৃত হয়েছে, নিজের সম্পর্কে এই দল মনে রাখবে যে, তাকেই সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

সাম্যবাদী সঙ্ঘের যে কার্যকলাপের কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা ছাড়াও নূতন দলের আদর্শ, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রচারকার্য চালিয়ে যাবার জন্য দেশের সর্বত্র সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভারতীয় জনসাধারণের জন্য সামগ্রিক স্বাধীনতা অর্থাৎ সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই হবে সাম্যবাদী সঙ্ঘের লক্ষ্য। জনসাধারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না সত্যকারের স্বাধীনতালাভ করছে, এই দলটি ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বপ্রকার পরাধীনতার বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতার শাশ্বত নীতির ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতে যাতে এক নবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় তার জন্য এই দলের উদ্দেশ্য হবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষ যে বাণী বহন করে এসেছে, সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশে তা যাতে সে প্রচার করতে পারে তার জন্য ভারতীয় আদর্শের চূড়ান্ত সিদ্ধিও এই দলের লক্ষ্য হবে।

শরৎ বসু য়্যাকাডেমির সৌজন্যে। নেতাজী ভবন, কলকাতা-২০।

(২)

ফরওয়ার্ড ব্লক ও তার যৌক্তিকতা

(১-১-১৯৪১)

আন্দোলনের বিকাশকে একটি বৃক্ষের বিকাশের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অন্তঃপ্রেরণা থেকেই তার বৃদ্ধি ঘটে, এবং প্রগতিকে অব্যাহত রাখবার জন্যে প্রতিটি পর্যায়েই সে নতুন নতুন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে দেয়। শাখাপ্রশাখা সৃষ্টির কাজ বন্ধ হলেই বুঝতে হবে যে, সেই আন্দোলন অবক্ষয় অথবা মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে।

যে-জমিতে আন্দোলনের জন্ম, সেই জমির থেকেই সে তার প্রাণরস আহরণ করে বটে, তবে বাইরের থেকেও—যথা আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক ইত্যাদির থেকেও তার পুষ্টি ঘটে। সৃষ্টিশীল আন্দোলনের পক্ষে অভ্যন্তরীণ প্রাণরস এবং বাইরের পুষ্টি—দুয়েরই প্রয়োজন।

আন্দোলনের মধ্যে জীবনীশক্তি থাকা সত্ত্বেও যখন তার প্রধান স্রোতোধারাটি শুকিয়ে আসতে থাকে, বামপন্থী দলের জন্মলাভ তখন অনিবার্য। প্রগতি ব্যাহত হবার আশঙ্কা দেখা দিলে তাকে নতুন শক্তিতে শক্তিশালী করে তোলাই হলো বামপন্থীদের প্রধান কাজ। প্রধান স্রোতোধারাটি তখন দক্ষিণ-পন্থী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং বামপন্থী দলের সৃষ্টি হবার পর দক্ষিণ-পন্থীদের সঙ্গে তাদের একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়। এই সংঘর্ষের পর্যায়টি সাময়িক; তার মধ্যে দিয়েই আন্দোলন একটি উচ্চতর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। সংঘর্ষেরও তখন অবসান ঘটে। মীমাংসাটা ঘটে কোনও পারস্পরিক মতৈক্য অথবা বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে এবং বামপন্থীরাই তখন সমগ্র আন্দোলনটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। এইভাবে বামপন্থীরাই একসময়ে আন্দোলনের প্রধান স্রোতোধারায় পরিণত হয়।

এই যে বিবর্তন, দার্শনিক ভাষায় একে বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে পারা যায় যে, "ক্রিয়া" (Thesis) থেকেই "প্রতি-ক্রিয়া"র (antithesis) সৃষ্টি, এবং এ-দুয়ের সংঘর্ষের থেকেই "সমন্বয়ে"র (Synthesis) উদ্ভব। এই "সমন্বয়"ই বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে আবার "ক্রিয়া"র ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই যে ক্রমবিবর্তন—যাকে "দ্বন্দ্বরীতি" বলা হয়—ঠিকমতো যদি একে উপলব্ধি করা যায় তো গত কয়েক দশকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে তার একটি নূতন অর্থ ও তাৎপর্যলাভ সম্ভব হবে। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে আমরা গান্ধী আন্দোলনকে বিচার করে দেখব।

এখানেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, আন্দোলনের অভ্যন্তরস্থ সংঘর্ষকে সর্বাবস্থায় ক্ষতিকর অথবা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করা ঠিক নয়। বরং বলা যায় যে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে যে-সংঘর্ষের সৃষ্টি, চিন্তাক্ষেত্রেই হোক্ আর কর্মক্ষেত্রেই হোক্ প্রগতির জন্যেই তা অপরিহার্য।

কখন অথবা কোন্ বিশেষ পর্যায়ে আন্দোলন তার গতিশক্তি হারিয়ে ফেলে জড়ত্বপ্রাপ্ত হতে শুরু করে, সেবিষয়ে কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত তার গ্রহিষ্ণুতা এবং সৃষ্টিশক্তি অব্যাহত থাকে, ততক্ষণ তার মধ্যে ধ্বংসের বীজ প্রবেশ করতে পারে না।

গান্ধী-আন্দোলনকে এবারে বিচার করে দেখা যাক।* মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর, ১৯১৯ সনে ভারতবর্ষে একটি নূতন অবস্থার উদ্ভব হলো, এবং নূতন নূতন সমস্যাও সেইসঙ্গে দেখা দিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে পরিচালনাভার যাঁদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, এই অবস্থার তাঁরা সম্মুখীন হতে পারলেন না। তার কারণ তাঁরা তাঁদের গতিশক্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছিলেন। সমগ্র কংগ্রেসকে যাতে জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে না হয় তারই জন্য স্পষ্টতঃ একটি বামপন্থী গোষ্ঠীর প্রয়োজন দেখা দিল। বামপন্থী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটল গান্ধী-আন্দোলনের ভূমিকায়। কিছুকালের জন্য সংঘর্ষ চলল; পুরোনো নেতাদের কংগ্রেস থেকে বিদায় নিতে হলো, স্বেচ্ছাতেও কেউ কেউ সরে দাঁড়ালেন। শেষ পর্যন্ত দেখা দিল "সমন্বয়"। কংগ্রেসকে মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ মেনে নিতে হলো এবং বামপন্থীরাই তখন কংগ্রেসের পরিচালনাভার প্রাপ্ত হলেন।

১৯২০ সনে গান্ধীবাদের হাতে কংগ্রেসের পরিচালনাভার আসে এবং কুড়ি বছর ধরে তার সেই প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এটা যে শুধু মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের দরুণ সম্ভব হয়েছে তা নয়; অন্যান্য ভাবধারা এবং নীতিকে গ্রহণ করবার যে-শক্তি মহাত্মা গান্ধীর বর্তমান তার জন্যও এটা সম্ভব হয়েছে। তা না হলে বহুদিন পূর্বেই কংগ্রেসের উপরে গান্ধীবাদের প্রভাবের অবসান হতো। গত কুড়ি বৎসরের ইতিহাসে যখনই কংগ্রেসের মধ্যে কোনও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, তখনই গান্ধী আন্দোলন অনেকাংশে তার ভাবধারা ও নীতিকে গ্রহণ

করেছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে সে আর খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। ১৯২৩ সনে স্বরাজ্য দলের উদ্ভবের পর যে সংঘর্ষ দেখা দেয়, অল্পকালের মধ্যেই তার অবসান ঘটেছিল। ১৯২৫ সনে কানপুর-কংগ্রেসে গান্ধীবাদীরা স্বরাজ্যদল-প্রস্তাবিত আইনসভার মধ্যে অসহযোগ চালিয়ে যাবার নীতি মেনে নেন এবং সমগ্র কংগ্রেস কর্তৃকই সে নীতি গৃহীত হয়।

এর পর ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা-কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্পর্কে স্বাধীনতা লীগের উদ্যোগে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ দেখা দেয়। মহাত্মা গান্ধী এই সময়ে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসপন্থী ছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত প্রস্তাবটিকে তিনি বাধাপ্রদান ও পরাজিত করেন। কিন্তু এক বৎসর পর লাহোর-কংগ্রেসে তিনি স্বয়ং এইমর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যে, অতঃপর স্বাধীনতাই হবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য।

অন্যান্যদের মতামতকে এইভাবে গ্রহণ করেই গান্ধী-আন্দোলন তার প্রগতিশীল চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং এইজন্যেই তখন বড় রকমের কোনও বামপন্থী আন্দোলনেরও সৃষ্টি হয়নি। ১৯৩১ সনের মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর সাময়িকভাবে আবার কিছুদিনের জন্যে পিছিয়ে পড়তে হলো বটে, তবে ১৯৩২ সনের জানুয়ারী মাসে সত্যাগ্রহ অথবা আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে গান্ধীজী তার ক্ষতিপূরণ করলেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে, এবং ১৯৩৩ সনের মে মাসে এই আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায়, নূতন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। তারই থেকে নূতন এক বিদ্রোহ জন্মলাভ করে। এবারে কিন্তু দক্ষিণপন্থীরাই ছিলেন তার উদ্যোক্তা। ১৯৩০ সনে মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবার পূর্বে ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে লাহোর-কংগ্রেসে আইনসভাগত কর্মপন্থা বাতিল করে দেওয়া হয়। আন্দোলনের ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে গান্ধীবাদীদের একটা বড় অংশ দাবী উত্থাপন করলেন যে, পুনরায় সেই কর্মপন্থা গ্রহণ করা হোক্। ১৯৩৪ সনে গান্ধীজী এই দাবী মেনে নিলেন। তার কারণ, কংগ্রেসের জন্য তাঁর তখন কোনও বিকল্প-পরিকল্পনা ছিলনা। এই ঘটনার থেকে আভাষ পাওয়া গেল যে, গান্ধী-আন্দোলনের মধ্যে জড়ত্ব দেখা দিয়েছে। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের মাধ্যমে একটা বড় রকমের বামপন্থী বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় এই ধারণারই সমর্থন মেলে। আইনসভাগত কার্যকলাপ পুনরারম্ভের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, সেই সময়েই ১৯৩৪ সনে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল প্রতিষ্ঠিত হয়।

গান্ধী-আন্দোলনের গ্রহিষ্ণুতা এবং অপরের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি একদিনেই নষ্ট হয়নি। ১৯৩৪ সনে, এবং তার পরেও, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট এবং অন্যান্য বামপন্থীদের প্রতি গান্ধীবাদীদের মনোভাব মোটামুটি উদারই ছিল। বস্তুতঃ ১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল থেকে প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাবও করা হয় (১৯৩৮ সনে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে)। ১৯৩৮ সনের জানুয়ারী মাসে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে গান্ধীবাদীরা কংগ্রেস-সভাপতিপদের জন্য আমাকে সমর্থন করলেন। ১৯৩৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে হরিপুরা-কংগ্রেসে আমি যখন ঐ বৎসরের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করি, গান্ধীজী তখন স্পষ্টই এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে সোস্যালিস্টদের গ্রহণ করবার ব্যাপারে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না।

দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সভার পরে, ১৯৩৮ সনের জুন মাসে মহাত্মা গান্ধীর মনোভাবের এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে। একটি বিতর্কমূলক বিষয় অবলম্বন করে বামপন্থীরা সেখানে সভাস্থল ত্যাগ করেছিলেন। সেইসময়েই গান্ধীজীকে একজন বলতে শোনেন যে, কংগ্রেসের কার্যপরিচালনার ব্যাপারে বামপন্থীদের সঙ্গে কোনও আপোষ চলতে পারে না। এর কয়েক মাস বাদে ১৯৩৯ সনের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেস-সভাপতিপদে আমার পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করে তিনি সেই মনোভাবেরই প্রমাণ দিলেন।

১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে গান্ধীবাদ আরও স্রোতোহীন ও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে থাকে। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে হরিপুরা-কংগ্রেসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে-দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা হলো ফেডারেশন ও আসন্ন মহাযুদ্ধ-সংক্রান্ত। ফেডারেশন সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল যে, এ-বিষয়ে আপোষহীন বিরোধিতা চালিয়ে যাওয়া হবে। তৎসত্ত্বেও সারাটা বছর প্রবল গুজব ছড়িয়ে পড়তে থাকে যে, গান্ধীবাদী দল ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে নেপথ্যে আপোষ-আলোচনা চলছে। আমার সভাপতিত্বের বিরুদ্ধে গান্ধী-পন্থীরা যে চার্জ-শীট্ এনেছিলেন, ফেডারেশন সম্পর্কে আমার আপোষহীন বিরোধিতা-নীতিই তাতে প্রথম স্থান লাভ করেছিল। বামপন্থীদের সম্পর্কে আমার যে-মনোভাবকে গান্ধীপন্থীরা অন্যায় মৈত্রী-নীতি বলে মনে করতেন, সেই সম্পর্কেই ছিল তাঁদের দ্বিতীয় অভিযোগ। আমি যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন ও তার উদ্বোধন করেছিলাম, সেই সম্পর্কেই তৃতীয় অভিযোগ আনয়ন করা হয়। গান্ধীপন্থী গঠনাত্মক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কুটিরশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। গান্ধীপন্থীরা মনে করলেন যে, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হওয়ায় কুটিরশিল্পের ক্ষতি হবে এবং ব্যাপক শিল্পোৎপাদন-ব্যবস্থাকেই উৎসাহ দেওয়া হবে। পরবর্তী অভিযোগে বলা হলো যে, ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র প্রদান করে অতঃপর অবিলম্বে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন পুনরারম্ভের আমি সমর্থক।

১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারলেন যে, ভবিষ্যতে গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীদের মৈত্রী-সম্পর্ক আর বজায় থাকবে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গান্ধীজী স্বয়ং খোলাখুলিভাবে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তনের কথা প্রকাশ করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, মিউনিক চুক্তির সময় কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ মহল পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ যদি যুদ্ধ-সংকটের কবলীভূত হয় তাহলে গান্ধীপন্থী দল ও বামপন্থীদের মধ্যে একটা প্রকাশ্য বিরোধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। একথা সত্য যে, ১৯২৭ সন (মাদ্রাজ-কংগ্রেস) থেকে ১৯৩৮ সন পর্যন্ত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে কংগ্রেসের যুদ্ধ-সংক্রান্ত নীতি পরিষ্কারভাবে বিবৃত করা হয়েছিল, এবং এই যুদ্ধ-সংক্রান্ত নীতির বিষয়ে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে কোনও বিরোধ দূরে থাক্ মতানৈক্য ঘটতে পারে বলেও সাধারণ অবস্থায় আশংকা করা যেত না। তৎসত্ত্বেও মিউনিক চুক্তির পূর্বে আন্তর্জাতিক সংকটের সময়ে বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে যেসমস্ত আলোচনা চলে তাতে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, কংগ্রেসের পূর্ববর্তী অধিবেশনসমূহে গৃহীত যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির সম্পর্কে গান্ধীপন্থীদের কোনও উৎসাহ নেই। এবং প্রয়োজন ঘটলে বা সুবিধা বুঝলে সেই প্রস্তাব লঙ্ঘনে তাঁরা দ্বিধা করবেন না। পক্ষান্তরে ফেডারেশন এবং আসন্ন যুদ্ধ—এ-দুটি প্রশ্ন সম্পর্কে বাম-পন্থীরা তখন কোনই আপোষ মেনে নিতে প্রস্তুত নন। ফলতঃ এ-দুটি বিষয়ে গান্ধীপন্থীদের দ্বিমুখী ও আপোষমূলক মনোভাব তাঁদের সঙ্গে বামপন্থীদের একটা বিরোধ ঘটবার পথই প্রশস্ত করে দিয়েছে।

মিউনিক চুক্তির ফলে ইউরোপে অল্প কিছুকালের জন্য যুদ্ধারম্ভ স্থগিত রইল বটে, তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁরা অনুভব করলেন, যুদ্ধ অনিবার্য এবং আসন্ন। আমার মনে তখন এই প্রত্যয়ের সঞ্চার হলো যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যে রূপপরিগ্রহ করেছে তাতে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীদের উপর জোর করে ফেডারেশন-ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার পরিকল্পনা ত্যাগ করবেন। ফেডারেশন-ব্যবস্থা আর তখন ভারতীয়দের আশু সমস্যা নয়, সুতরাং তাদের এবারে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা সম্পর্কে

একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার। ফেডারেশন-ব্যবস্থা নিয়ে বহুপ্রত্যাশিত সংগ্রাম ঘটবার সম্ভাবনা যখন আর নেই, কীভাবে তারা তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালিয়ে যাবে?

১৯৩৮ সনের নবেম্বর মাসে উত্তর-ভারত সফরকালে আমি এই সমস্যার একটা সমাধান প্রস্তাব করি। আমি তখন বলেছিলাম যে, সরকার কখন উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে তার জন্য অপেক্ষা করা নিরর্থক। সাময়িকভাবে হলেও ফেডারেশন-ব্যবস্থা যখন মুলতুবী রয়েছে, এবং যুদ্ধ যখন আসন্ন, কংগ্রেসেরই তখন উদ্যোগী হয়ে কার্যারম্ভ করা দরকার। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা দাবী করে ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র প্রদান এবং জাতীয় সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করতে শুরু করাই হলো তার প্রকৃষ্ট পন্থা। নবেম্বর মাস থেকে আমরা ব্যাপকভাবে এই কথা প্রচার করে যাই এবং ১৯৩৯ সনের মার্চ মাসে ত্রিপুরী-কংগ্রেসে এটিকে প্রস্তাবাকারে উত্থাপন করা হয়। কিন্তু গান্ধীপন্থীদের উদ্যোগে এ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়। প্রস্তাবটিতে অন্যান্য কথার মধ্যে বলা হয়েছিল যে, ব্রিটিশ সরকারের কাছে চরমপত্র পেশ করবার পর এ-বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট উত্তর দেবার জন্য তাঁদের ছ'মাস সময় দেওয়া হবে। ত্রিপুরী-কংগ্রেসের ছ'মাস পর ইউরোপে যুদ্ধারম্ভ হলো। যে-গান্ধীপন্থীরা ত্রিপুরীতে এই প্রস্তাবের এত বিরোধী ছিলেন তাঁরাও তখন প্রস্তাবটির অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক জ্ঞানের কথা স্বীকার করলেন।

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হবার অব্যবহিত পরেই মহাত্মা গান্ধী একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাতে যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যাপারে বিনাশর্তে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছিল। কার্যতঃ তিনিই তখন কংগ্রেসের একনায়ক। এগার বৎসর ধরে ক্রমান্বয়ে কংগ্রেস যে-সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, সুবিধা বুঝে তা ভুলে যাওয়া হলো (যুদ্ধারম্ভের পর সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ফেডারেশন-ব্যবস্থা মুলতুবী রাখা হয়)।

১৯৩৮ সনের পর থেকে আমরা বামপন্থীরা যে-সমস্ত বিষয়ে গান্ধী-পন্থীদের সঙ্গে বিরোধের সম্মুখীন হয়েছি এবং যে-বিষয়ে কোনও আপোষ সম্ভব হয়নি তা হলো স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রাম পুনরারম্ভ ও যুদ্ধ-সম্পর্কে ভারতবাসীদের যথার্থ নীতি নির্ধারণ। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪০ সনের নবেম্বর মাস পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী ঘরোয়া বৈঠকে এবং প্রকাশ্যে এই কথাই ঘোষণা করে এসেছেন যে, সত্যাগ্রহ অথবা আইন-অমান্যের কোনও কথাই উঠতে পারে না; এবং কেউ যদি এরকম কোনও আন্দোলন আরম্ভ

করেন তো দেশের তাতে ক্ষতি করা হবে। ১৯৪০ সনের নবেম্বর মাসে তাঁর উদ্যোগে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করা হয়েছিল সত্য, তবে গান্ধীজী নিজেই এ-সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এটা কোনও ব্যাপক জন-সংগ্রাম নয়। আমরাও সে-কথা জানি। এই আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারকে তেমন কিছু বিব্রত করতে পারে নি। ভারতবর্ষে ও ইংল্যাণ্ডে দায়িত্বশীল কয়েকজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ইতিমধ্যেই সে-কথা ঘোষণা করেছেন। যুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের জয়লাভই ছিল মহাত্মা গান্ধীর কাম্য। এই কামনার সঙ্গে সঙ্গতিবিধানার্থেই তিনি সরকারের পক্ষে বিব্রতিকর কোনও অবস্থার সৃষ্টি করেন নি। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ব্যাপক জন-সংগ্রাম শুরু করা হলে সেই বিব্রতিকর অবস্থার সৃষ্টি হতো।

১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যাপারে বিনাশর্তে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ১৯৪০ সনের নবেম্বর মাসে তিনি যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারকার্য চালাবার স্বাধীনতা দাবী করলেন। ১৯৩৮ সনের পর থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয়-সংগ্রাম পুনরারম্ভের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার তিনি নিন্দা করে এসেছেন। কিন্তু ১৯৪০ সনের নবেম্বর মাসে তাঁর সেই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল। এমনকি ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলনও তিনি শুরু করলেন। এ-পরিবর্তনের কারণ কী, তা নিয়ে কি প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে না? এবং যদি বলা যায় যে, বামপন্থীদের চাপের দরুণই মনোভাবের এই পরিবর্তন ঘটেছে তো কথাটা কি ভুল হবে?

দীর্ঘদিন ধরে একনিষ্ঠভাবে গান্ধীজী যে নীতির কথা প্রচার করে এসেছেন, চাপের দরুণ এবং আংশিকভাবে হলেও যে তাঁর বর্তমান বয়সেও তিনি সেই নীতির পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হলেন এতে করে প্রমাণিত হয় যে, অবস্থার সঙ্গে নিজেকে তিনি খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম; প্রমাণিত হয় যে, তিনি চলিষ্ণু। তা-সত্ত্বেও এ-পরিবর্তন সময়ের দাবী মেটাতে পারেনি। আমরা আজ "ব্লিৎস্‌ক্রীগে"র যুগে বাস করছি, এবং সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলে আমাদের পিছিয়ে পড়তে হবে। গান্ধীজী যে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে এবং জাতিকে পরিচালনা করতে সক্ষম, এখনো পর্যন্ত নিজের কাজের মাধ্যমে তিনি তার প্রমাণ দিতে পারেন নি। এবং এতে করে আমাদের পূর্বোক্ত বিশ্বাসই সমর্থিত হয় যে, গান্ধী-আন্দোলন স্রোতোহীন ও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে।

১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে গান্ধীপন্থীরা প্রগতিশীল ভাব-ধারার প্রতি যে আপোষহীন মনোভাবের পরিচয় দিয়ে আসছেন, এবং কংগ্রেস

থেকে সজীব ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে বিতাড়িত করবার জন্যে তাঁদের যে ক্রমবর্ধমান অভিলাষ ও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি ও চলিষ্ণুতা তাঁরা হারিয়ে ফেলছেন। শুধু তা-ই নয়, এতে করে ক্রমেই তাঁরা আরো নিশ্চল হয়ে পড়বেন। গান্ধীপন্থীদের জন্য গান্ধীজী যেসমস্ত অ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চালু করেছেন (যথা নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ, গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, হরিজন সেবক সঙ্ঘ, নিখিল ভারত গ্রামশিল্প সমিতি, হিন্দী প্রচার সমিতি ইত্যাদি) অ-রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করে ভবিষ্যতে তা গান্ধী-আন্দোলনের রাজনৈতিক গতিশক্তিকেও ক্ষুণ্ণ করবে। ইতিমধ্যেই তা শুরু হয়ে গিয়েছে। সর্বোপরি, নির্বিঘ্ন পার্লামেণ্টারী জীবন এবং মন্ত্রিত্বই রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধী-বাদের সমাধি রচনা করেছে। ভবিষ্যতেও করবে।

গান্ধী-আন্দোলনের মধ্যে যাও-বা বৈপ্লবিক প্রাণশক্তি ছিল, মন্ত্রিত্বগ্রহণই তার সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করেছে। এরই প্রভাবে পড়ে যে বহুসংখ্যক কংগ্রেস-কর্মী বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ পথ থেকে সরে এসে নিয়মতান্ত্রিকতার পুষ্পাচ্ছাদিত পন্থা অবলম্বন করেছেন, এ-কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। ১৯৩৭ সনে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, এবং ১৯৩৮ সনেই কংগ্রেসের মধ্যে এক নয়া-নিয়মতান্ত্রিকতা ভয়াবহভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এই যে "ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন," কংগ্রেস নিজেই এর জন্মদাতা। এবং ১৯৩৮ সন থেকে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই হয়েছে বামপন্থীদের প্রধান কাজ। নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে কংগ্রেসের এই ক্রমাগ্রগতিকে কীভাবে ব্যাহত করা যায়, নয়া-নিয়মতান্ত্রিক মনোভাবের পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে নতুন করে কীভাবে আবার বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করা যায়, সাহস সহকারে কীভাবে যুদ্ধ-সংকটের সম্মুখীন হওয়া যায়, কীভাবে কংগ্রেসকে আবার আপোষবিহীন জাতীয় সংগ্রামের পথে ফিরিয়ে আনা যায় এবং কীভাবেই বা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী-প্রাধান্যের সৃষ্টি করা যায়,—১৯৩৮ সনের পর থেকে এইগুলিই হয়েছে বামপন্থীদের প্রধান সমস্যা।

গান্ধী-আন্দোলন যে আজ শুধু নিয়মতান্ত্রিকতার কবলীভূত হয়েছে তা নয়, সেইসঙ্গে কর্তৃত্বের মোহও তাকে গ্রাস করেছে। সাংগ্রামিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিছু-পরিমাণে কর্তৃত্বভাব থাকা স্বাভাবিক, এবং তা মেনে নেওয়াও চলে। কিন্তু কর্তৃত্বভাবের যে বাড়াবাড়ি আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তারও সেই একই কারণ। মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণের পর গান্ধীপন্থীরা ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছেন; এ-ক্ষমতায় ভবিষ্যতে যাতে শুধু তাঁদের একচেটিয়া অধিকার থাকে তারই জন্যে

তাঁরা এখন ব্যগ্র। ইদানীং কংগ্রেসের মধ্যে যা চলছে তা নিছক "ক্ষমতা-কাড়াকাড়ির রাজনীতি," যদিও খানিকটা নকল ধরণের। এই "ক্ষমতা-কাড়াকাড়ির রাজনীতি"র উৎসস্থল হলো ওয়ার্ধা। গান্ধীপন্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে চিরকাল তাঁদের প্রাধান্য বজায় রাখতে পারেন তার জন্য কংগ্রেসের মধ্যে সর্বপ্রকার বিরোধিতার মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়াই হলো এই "ক্ষমতা-কাড়াকাড়ির রাজনীতি"র লক্ষ্য। কিন্তু এ কৌশল সাফল্যমণ্ডিত হবে না। প্রকৃত ক্ষমতা এখনো আসেনি; নিয়মতান্ত্রিকতার বিঘ্নহীন পথ অবলম্বন করলে কোনওদিনই আমরা সে-ক্ষমতা অর্জন করতে পারব না। গান্ধীপন্থীরা অবশ্যই কংগ্রেস থেকে বিরোধী শক্তিগুলিকে বিতাড়িত করে একে একটা ঘনসন্নিবিষ্ট গোষ্ঠীতে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভারতবর্ষকে তাঁরা স্বাধীনতা এনে দিতে পারবেন। এবং প্রকৃত ক্ষমতা না এলে প্রকৃত "ক্ষমতা-কাড়াকাড়ির রাজনীতি"ও অসম্ভব। সুতরাং আজ আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা নকল "ক্ষমতা-কাড়াকাড়ির রাজনীতি" ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়।

গান্ধীপন্থীরা যদি বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন হতেন তাহলে ক্ষমতার উপরে তাঁদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা অথবা সর্বব্যাপারে তাঁদের কর্তৃত্ব করবার চেষ্টায় ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনই আপত্তি থাকত না। দুর্ভাগ্যবশতঃ, গান্ধী-বাদের মধ্যে এখন আর বৈপ্লবিক চেতনার অস্তিত্ব নেই। এমন আশাও নেই যে, জাতিকে স্বাধীনতার দুয়ারে পেঁৗছে দিতে তাঁরা সক্ষম হবেন। ফলতঃ, আমাদের গান্ধীপন্থী বন্ধুরা যতই নিজেদের ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবকে দৃঢ় করতে যাবেন, কংগ্রেসকেও ততই তাঁরা গতিশক্তিহীন করে তুলবেন। বিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যদৃচ্ছভাবে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে কংগ্রেসকে এখনকার তুলনায় অধিকতর ঐক্যসম্পন্ন করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু এ-প্রক্রিয়া বহিঃশত্রুর সংখ্যাবৃদ্ধি করবে এবং শেষ পর্যন্ত এতে করে কংগ্রেসের ভিত্তিমূলেই আঘাত হানা হবে। দেশের উপর কংগ্রেসের এখন যে প্রভাব রয়েছে, তা-ও তাতে হ্রাস পাবে।

গান্ধীপন্থীরা এখন কংগ্রেসের মধ্যে নিজেদের শক্তিকে সংহত করবার যে চেষ্টা করছেন, আসলে তা "দক্ষিণপন্থী-সংহতি" ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। দৃষ্টির অগোচরে দীর্ঘদিন ধরেই ধীরে ধীরে এ-কাজ চলছিল। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর তা ত্বরান্বিত হয়েছে। বিপদ বুঝবার পর বামপন্থীরা যখন আত্মরক্ষার্থে সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করলেন, গান্ধীবাদী মহলে তখন একটা হৈ-চৈয়ের সৃষ্টি হলো। তাঁদের কাছে আত্ম-সংহতি অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী-সংহতিটাই হলো ন্যায়-সঙ্গত ও স্বাভাবিক; বামপন্থী-সংহতি একটা অপরাধ।

গান্ধীবাদ যখন থেকে গতিশক্তি হারাতে শুরু করেছে এবং বামপন্থী শক্তি তাকে বাধাপ্রদান করতে অগ্রসর হয়েছে, তখন থেকেই গান্ধীপন্থীরা দক্ষিণ-পন্থীতে পরিণত হয়েছেন, এবং তখন থেকেই গান্ধীপন্থী-সংহতি বলতে দক্ষিণপন্থী-সংহতিই বোঝায়।

দার্শনিক ভাষায় বলা যায় দক্ষিণপন্থী-সংহতি হলো "ক্রিয়া"; "প্রতি-ক্রিয়া"র জন্য এখন বামপন্থী-সংহতির প্রয়োজন। এই "প্রতি-ক্রিয়া" এবং তজ্জনিত সংঘর্ষ না ঘটলে আর অগ্রগতি সম্ভব নয়। এ-কারণে যাঁরা প্রগতিতে আস্থাশীল, প্রগতি যাঁদের কাম্য, বামপন্থী-সংহতির কাজে তাঁদেরকে সক্রিয়-ভাবে সহযোগিতা করতে হবে; তজ্জনিত সংঘর্ষের জন্যও তাঁদের প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের অল্পকিছুদিন পরেই ১৯৩৯ সনের মে মাসে বামপন্থী-সংহতি সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্মলাভ। কংগ্রেসের উল্লিখিত অধিবেশনে আমি সভাপতিপদে ইস্তফা দিয়েছিলাম।

নিম্নলিখিত পন্থাসমূহের যে-কোনও একটি অবলম্বন করে বামপন্থী-সংহতি সম্ভব হতোঃ—

(ক) একটি দল গঠন করা এবং সকল বামপন্থী শক্তিকে তার মধ্যে সমবেত করা। এ-কাজ সম্ভব হয়নি। তার কারণ এমন একাধিক দল তখন বর্তমান, নিজেদের যাঁরা বামপন্থী বলে দাবী করতেন। নিজেদের পৃথক অস্তিত্বকে বিসর্জন দিতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না।

(খ) এমন একটি নূতন ব্লক সংগঠন করা সমস্ত বামপন্থী ব্যক্তি ও বামপন্থী দল যাতে যোগদান করবেন। ইচ্ছে হলে নিজেদের স্বতন্ত্র দলগত পরিচয় তাঁরা বজায় রাখতে পারবেন।

ফরওয়ার্ড ব্লক যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এইটেই ছিল তার প্রথম লক্ষ্য ও উদ্যম। বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে সে বিরোধিতার সূত্রপাত করতে চায়নি, তাদের কারুর ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যও তার ছিল না। ব্লকের প্রস্তাব গ্রহণ করে নিজ নিজ স্বতন্ত্র পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেও বামপন্থী দলগুলি যদি ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করতেন, সহজে এবং অবিলম্বে তাহলে বামপন্থী-সংহতি সাধন সম্ভব হতো। দক্ষিণপন্থীরাও তাহলে একটি দুর্জয় শক্তির সম্মুখীন হতেন। বামপন্থী স্বার্থের দুর্ভাগ্য, এ-প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। কয়েকটি বামপন্থী দল তাঁদের সদস্যদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন যে, নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকে তাঁরা যোগদান করতে পারবেন না। এইসমস্ত দলের এই দুর্বোধ মনো-ভাবের কারণ কী, তা নিয়ে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

(গ) এমতাবস্থায় বামপন্থী-সংহতির জন্য নিম্নোক্ত পন্থায় নতুন করে একবার চেষ্টা করা হলো। বামপন্থী দলসমূহ ও ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে স্থির হলো যে, বামপন্থী-সংহতি কমিটি নামে নূতন একটি কমিটি গঠন করা হবে। সমগ্র বামপন্থার মুখপাত্র হিসেবেই এই কমিটি কাজ করবেন বটে, তবে সে-কাজের পিছনে কমিটিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের সর্বসম্মত সমর্থন থাকা চাই।

১৯৩৯ সনের জুন মাসে বোম্বাইয়ে এই বামপন্থী-সংহতি কমিটি গঠিত হয়। অবিলম্বে তার আশ্চর্য ফল দেখা গেল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তখন অধিবেশন চলছিল। সমগ্র বামপন্থী শক্তি সেখানে এই সর্বপ্রথম একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। সংখ্যায় অল্প হলেও বামপন্থীদের বিরোধিতার ফলে কংগ্রেস-গঠনতন্ত্রের কয়েকটি পরিবর্তন সাধন সম্ভব হলো। দক্ষিণপন্থীরা এই পরিবর্তন ঘটাতে অত্যন্তই ব্যগ্র ছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সেই অধিবেশনে নৈতিক দিক থেকে বামপন্থীরা জয়লাভ করলেন। বামপন্থীদের পক্ষে সেটাকে একটা শুভসূচনা বলা যেতে পারে।

কিন্তু ১৯৩৯ সনের ৯ই জুলাই তারিখে বামপন্থী-সংহতি কমিটির উপরে প্রথম আঘাত এসে পড়ল। আঘাত হানলেন শ্রী এম এন রায়। বামপন্থীদের তীব্র বিরোধিতাসত্ত্বেও জুন মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই-অধিবেশনে বামপন্থী-বিরোধী ধরণের দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। বামপন্থী-সংহতি কমিটি সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রস্তাব দু'টির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনার্থে ৯ই জুলাই তারিখে নিখিল ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করা হবে। জুলাই মাসে কংগ্রেস-সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ একটি বিবৃতি প্রদান করলেন। নিখিল ভারত দিবস পালনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য বাম-পন্থীদের প্রতি নির্দেশ জানিয়ে তাতে বলা হলো যে, নির্দেশ অমান্য করলে শৃঙখলামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। এই ভীতিপ্রদর্শনের ফলে শ্রী এম এন রায় শেষমুহূর্তে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর দল র‍্যাডিক্যাল লীগ নিখিল ভারত দিবস পালনের ব্যাপারে যোগদান করবে না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকেও এই মর্মে অনুরোধ জানিয়ে তিনি এক তার পাঠালেন যে, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল যাতে নিখিল ভারত দিবস পালনের ব্যাপারে অংশগ্রহণ না করে তার জন্য তাঁর প্রভাব যেন তিনি কাজে লাগান। শ্রী এম এন রায়কে সবাই তখন বামপন্থী নেতা বলেই জানেন; তাঁর র‍্যাডিক্যাল লীগও তখন বামপন্থী-সংহতি কমিটিতে অংশগ্রহণকারী অন্যতম দল। সুতরাং যে-কাজ তিনি করলেন,

বামপন্থী স্বার্থের প্রতি তাতে বিশ্বাসঘাতকতাই করা হলো; দক্ষিণপন্থীরাও তাতে খুশী হলেন।

র‍্যাডিক্যাল লীগ এইভাবে সরে দাঁড়ানোর ফলে একটু অসুবিধার সৃষ্টি হলো বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যথারীতি কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর তাঁদের ঐক্যবদ্ধ থাকবার সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হয়ে উঠল। কিন্তু অক্টোবর মাসে দেখা দিল এক নতুন সঙ্কট। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের নেতৃবৃন্দ লক্ষ্ণৌতে ঘোষণা করলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁদের দল নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে যাবে, বামপন্থী-সংহতি কমিটির নির্দেশ মান্য করে চলবে না। এই ঘোষণা সত্ত্বেও কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কিছুকালের জন্য তাঁদের আলাপ-আলোচনা চলল।

বামপন্থী-সংহতি কমিটির উপর পরবর্তী আঘাত এসে পড়লো ১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে। ঐ সময় ফরওয়ার্ড ব্লক ও ন্যাশনাল ফ্রণ্টের মধ্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে এই দুই সংস্থার সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের প্রাক্কালে অক্টোবর মাসে নাগপুরে যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা তাতে যোগদান না করলেও ফরওয়ার্ড ব্লক, কিষাণ সভা ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে ন্যাশনাল ফ্রণ্টও বেশ উৎসাহের সঙ্গেই তাতে অংশগ্রহণ করেছিল। অক্টোবর মাসেই কয়েকদিন বাদে কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা লক্ষ্ণৌতে বামপন্থী-সংহতি কমিটি থেকে সরে দাঁড়ানোর পরেও ফরওয়ার্ড ব্লক ও ন্যাশনাল ফ্রণ্ট একযোগে কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক জানতে পারল যে, বাইরে বাইরে বামপন্থী-সংহতি কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করলেও ন্যাশনাল ফ্রণ্ট ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, জানা গেল যে, ন্যাশনাল ফ্রণ্টের একটি পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে ফরওয়ার্ড ব্লককে তাতে প্রতিবিপ্লবী সংস্থারূপে চিত্রিত করা হয়েছে এবং নানাভাবে তার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। ১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ব্লক ও ন্যাশনাল ফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে এই বিষয়টি উত্থাপন করা হলো। ন্যাশনাল ফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ সেখানে উল্লিখিত প্রবন্ধ সম্পর্কে দায়িত্ব অস্বীকার করতে অথবা প্রবন্ধটি প্রত্যাহার করতে অসম্মত হলেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃবৃন্দ তখন তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে, একটি "প্রতিবিপ্লবী সংস্থা"র

পক্ষে বামপন্থী-সংহতি কমিটিতে ন্যাশনাল ফ্রন্টের সঙ্গে একযোগে কাজ করা সম্ভব নয়।

ন্যাশনাল ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের আচরণে বোঝা গেল যে, নিজেদের সংস্থাটিকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা বামপন্থী-সংহতি কমিটিকে কাজে লাগাতে চান; অথচ একই সঙ্গে কমিটির অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রকাশ্যে ও গোপনে আপত্তিকর প্রচারকার্যও চালিয়ে যাবেন।

১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় বিরোধ সৃষ্টি হবার পর ন্যাশনাল ফ্রণ্ট কর্তৃক খোলাখুলিভাবেই ফরওয়ার্ড ব্লককে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, ফরওয়ার্ড ব্লক যদি কংগ্রেসের থেকে স্বতন্ত্রভাবে কোনও জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করে তাহলে ন্যাশনাল ফ্রণ্ট প্রকাশ্যেই তার নিন্দা ও প্রতিরোধ করবে।

অন্যান্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের বঙ্গীয় শাখা ও ন্যাশনাল ফ্রণ্টের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হওয়ায় দুই দলের এই ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পেল।

বামপন্থী-সংহতি কমিটি গঠিত হবার পূর্বেও বাংলায় এই ধরণেরই একটা প্রতিষ্ঠান চালু ছিল। ফলতঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বাম-পন্থীদেরই ছিল বিপুল সংখ্যাধিক্য। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হবার পরে তাঁদের অধিকাংশই ব্লকে যোগদান করেন। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বামপন্থী-সংহতি কমিটি গঠিত হওয়ায় স্বভাবতঃই বামপন্থী ঐক্য আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল।

১৯৩৯ সনের ৯ই জুলাইয়ের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নিখিল-ভারত দিবসে অংশগ্রহণের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির (অর্থাৎ আমার) বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বামপন্থী অংশের সকলেই—ন্যাশনাল ফ্রণ্টও তাঁদের মধ্যে ছিলেন—এ-ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। শীঘ্রই বুঝতে পারা গেল যে, ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা তাঁদের উপর্যুপরি অবাঞ্ছনীয় হস্তক্ষেপ ও নিগ্রহ-ব্যবস্থার সূচনামাত্র। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বামপন্থীরা তখন স্থির করলেন, ওয়ার্কিং কমিটির কাছে নতিস্বীকার না করে তাঁরা প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন। কয়েক মাস পরে স্পষ্ট বোঝা গেল, সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই ওয়ার্কিং কমিটি দৃঢ়সংকল্প; বিধিসম্মত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে সাস্‌পেণ্ড করে তার জায়গায় একটি এড্‌ হক্‌ কমিটি প্রতিষ্ঠা করতেও তাঁরা পেছপা হবেন না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস

কমিটির ন্যাশনাল ফ্রণ্টপন্থী সদস্যরা এইসময় দুর্বলতার পরিচয় দিতে শুরু করলেন; ওয়ার্কিং কমিটির নিগ্রহ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক মনোভাব বজায় রাখতেও তাঁদের অনিচ্ছা দেখা গেল। অন্যান্য বামপন্থীরা একে কঠোর সংগ্রামের মধ্যে একটা বিশ্বাসঘাতকতার সামিল বলেই গণ্য করলেন। মনে হলো, শৃঙখলামূলক ব্যবস্থাবলম্বনের ভয়ে ন্যাশনাল ফ্রণ্টপন্থীরা ভীত হয়ে পড়েছেন। ন্যাশনাল ফ্রণ্টপন্থীরা কিন্তু তাঁদের প্রকৃত মনোভাবকে চেপে রাখতে চাইলেন, এবং এই বলে প্রসঙ্গ-পরিবর্তনের চেষ্টা করতে লাগলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগত একটা সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে বামপন্থী সংস্থা হিসেবে ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবীতে সরকারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন শুরু করাই হলো বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্তব্য। অন্যান্য বামপন্থীরা তাতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু একইসঙ্গে এ-ও তাঁরা চেয়েছিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানগত প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়া হোক্। কিছুদিন মন-কষাকষি চলবার পর শেষ পর্যন্ত ১৯৪০ সনের জানুয়ারী মাসে ন্যাশনাল ফ্রণ্ট ও অন্যান্য বামপন্থীদের মধ্যে একটা মীমাংসা সাধিত হলো। তাতে স্থিরীকৃত হলো যে, ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যেমন আন্দোলন আরম্ভ করবেন, ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের ব্যাপারেও তেমনি ন্যাশনাল ফ্রণ্টপন্থীদেরকে অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে যোগদান করতে হবে। ১৯৪০ সনের জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি পূর্ব-ব্যবস্থামত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আন্দোলন আরম্ভ করলেন, এবং সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জনসভাও অনুষ্ঠিত হতে লাগল। কিছুকাল বাদেই কিন্তু দেখা গেল যে, ন্যাশনাল ফ্রণ্টপন্থীরা যখন কোনও জনসভার অনুষ্ঠান করেন, পূর্বাহ্নেই তাঁরা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে নেন। ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। ন্যাশনাল ফ্রণ্টপন্থীরা তাতে যোগ তো দেনই নি, কয়েকজন কার্যতঃ তার বিরোধিতাও করেছেন। শুধু তা-ই নয়। ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে রামগড়ে নিখিল ভারত আপোষবিরোধী সম্মেলনে ফরওয়ার্ড ব্লক কর্তৃক যখন দেশব্যাপী এক আন্দোলন আরম্ভ করবার কথা ঘোষণা করা হয়, ন্যাশনাল ফ্রণ্টপন্থীরা তাকে বাধাপ্রদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

আন্দোলনে অংশগ্রহণের কথা এই পর্যন্তই থাক্। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের ব্যাপারেও ন্যাশনাল ফ্রণ্টপন্থীরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রাখেন নি। ধীরে ধীরে তাঁরা সরে পড়তে লাগলেন। বামপন্থীপ্রধান বৈধ বি পি সি সি'কে অবাঞ্ছনীয় ও আইনবিরুদ্ধভাবে খারিজ করে ওয়ার্কিং কমিটি

যখন তার জায়গায় একটি এড হক্ কমিটি খাড়া করলেন, ন্যাশনাল ফ্রণ্টপন্থীরা তখন নিঃশব্দে অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেছেন। অন্যান্য বামপন্থীরা স্থির করলেন যে, হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশ তাঁরা অমান্য করবেন। বৈধ বি পি সি সি'ও কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। ন্যাশনাল ফ্রণ্টপন্থীরা প্রথমটায় ঘোষণা করলেন যে, কোনওপক্ষেই তাঁরা যোগ দেবেন না; এই কথা বলে তাঁরা নিরপেক্ষভাব দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিছুদিন বাদেই কিন্তু তাঁরা তাঁদের সদস্যপদকে স্বীকার করে নেবার জন্য এড হক্ কমিটির কাছে আবেদন জানাতে শুরু করলেন। আজ তাঁরা তাঁদের সর্বলজ্জা বিসর্জন দিয়ে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে তাঁরা সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারেন না।

বাংলা দেশে ফরওয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য বামপন্থীদের প্রতি ন্যাশনাল ফ্রণ্টের এই যে আচরণ, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, এবং ১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় সর্বভারতীয় তাৎপর্যসম্পন্ন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই দুই পক্ষের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল তা আরও বেড়ে গেল।

১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসের ঘটনাবলীর পর ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণ-সভাই শুধু বামপন্থী-সংহতি কমিটিতে রইল। ধীরে ধীরে তাদের সহযোগ-সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। তাদের সহযোগিতা ও উদ্যমেই ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন চলতে থাকাকালে নিখিল ভারত আপোষবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন অত্যন্তই সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিল।

আদৌ ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করা হলো কেন, এবং চালু বামপন্থী দলগুলির উপরেই বা কেন বামপন্থী-সংহতি সাধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি, সে-প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। বস্তুতঃ সেরকম চেষ্টা করা হয়েছিল। সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতঃপর এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যাতে বামপন্থীদের একপতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করা ও দক্ষিণপন্থী-সংহতিকে প্রতিরোধ করবার জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা একটি অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দেখা দিল।

১৯৩৪ সন ও তৎপরবর্তী সময়ে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল, র‍্যাডিক্যাল লীগ এবং এইরকম আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ায় এবং ন্যাশনাল ফ্রণ্টের কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্তের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের প্রভাব ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৭ সন পর্যন্ত এই বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। ১৯৩৮ সনে বৃদ্ধিটা ব্যাহত হয়। ১৯৩৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে

হরিপুরা-কংগ্রেসে তা স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল। কীভাবে বামপন্থীদের শক্তি-বৃদ্ধি করা যেতে পারে, হরিপুরা-কংগ্রেসের পর বিভিন্ন দলভুক্ত বামপন্থীরা একযোগে তা চিন্তা করতে লাগলেন। ১৯৩৯ সনের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৩৯ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই চেষ্টা চলল। ঐ সময়ে একটি বামপন্থী-ব্লক গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ব্লক-সংগঠনের কাজে উদ্যোগী হবার জন্য তখন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল ও ন্যাশনাল ফ্রণ্টকে অনুরোধও করা হয়। এই সমস্ত প্রচেষ্টায় আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এবং আমার মত আরও অনেকে—তখনও পর্যন্ত যাঁরা কোনও দলে যোগদান করেননি—বামপন্থী ব্লককে সমর্থন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল ও ন্যাশনাল ফ্রণ্ট—বামপন্থী-ব্লক গঠনের প্রস্তাবে দুটি প্রতিষ্ঠানই প্রথমটায় খুব উৎসাহ দেখিয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত এ-চিন্তা তারা বিসর্জন দেয়। কেন যে তারা এরকম করল, আজ পর্যন্তও সে-রহস্যের আমি সমাধান করতে পারিনি। বোধ হয় তারা ভেবেছিল যে, বামপন্থী-ব্লক সংগঠিত হলে এবং তা প্রভাবশালী হয়ে উঠলে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব হ্রাস পাবে। সে যা-ই হোক না কেন, সময়মতো বামপন্থী-ব্লকটি প্রতিষ্ঠিত হলে এই সংস্থাটিই যে ফরওয়ার্ড ব্লকের স্থলাভিষিক্ত হতো, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বামপন্থী-ব্লক সংগঠনে ব্যর্থতার জন্য প্রধানতঃ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল ও ন্যাশনাল ফ্রণ্টই দায়ী।

চালু দলগুলি বামপন্থী স্বার্থকে রক্ষা করতে পারল না কেন এবং কেনই বা একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ঘটল? তার উত্তর হলো এই যে, যে-কোনও কারণেই হোক্, বামপন্থী পক্ষে যাঁদের যোগদান করা উচিত ছিল এবং সেখানে যাঁদের টেনে আনা যেত, চালু দলগুলি তাঁদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। তার কারণ বোধহয় এই যে, সমাজবাদ প্রচারেই তারা তখন বড় বেশী ব্যস্ত। কিন্তু সেটা হলো ভবিষ্যতের ব্যাপার। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রণ্টটিকে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী করে তোলা এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলাই ছিল তাদের আশু কর্তব্য। দক্ষিণপন্থী-সংহতি এবং বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্বগ্রহণের পর নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি কংগ্রেসের ক্রমাগ্রগতিতে বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্মী তখন ভীত হয়ে উঠেছেন। স্বভাবতঃই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রণ্টটিকে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করে তুলতেই তাঁরা তখন অধিকতর আগ্রহশীল। এঁদেরই সহায়তায় দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণকে প্রতিহত করা এবং কংগ্রেসে বামপন্থী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবার আশা করা যেত। যে ন্যূনতম পরিমাণ সাম্রাজ্যবাদ-

বিরোধী কার্যপন্থা গ্রহণ করলে প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধীদের একপতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া যেত, বামপন্থী ব্লকের কার্যসূচীতে সেইটুকু মাত্র গ্রহণ করা হবে বলে স্থিরীকৃত হয়।

ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠাকালেও আমাদের এই একই উদ্দেশ্য ছিল। নিয়মতান্ত্রিকতার পথে কংগ্রেসের ক্রমাগ্রগতিকে ব্যাহত করা, কংগ্রেসকে পুনরায় একটি বৈপ্লবিক সংস্থায় পরিণত করা, তাকে জাতীয় সংগ্রামের পথে ফিরিয়ে আনা এবং আসন্ন যুদ্ধ-সংকটের জন্য দেশকে প্রস্তুত করে তোলাকেই আমরা আমাদের আশু কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিলাম।

ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্মকালের পর থেকে ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফরওয়ার্ড ব্লকেরও দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু অন্যান্য দলকে একই সংস্থায় এনে সঙ্ঘবদ্ধ করবার মৌল পরিকল্পনাকে সে সফল করে তুলতে পারেনি। তার অর্থ কি এই যে, বামপন্থী-সংহতির কোনও আশাই আর নেই? না, তা নয়। তার অর্থ এই যে, অন্য কোনও উপায়ে বামপন্থী-সংহতি সম্ভবপর হবে।

বামপন্থার প্রকৃত অর্থ কী, তা নিয়ে এখানে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান যখন দাবী করেন যে তাঁরা বামপন্থী, তখন তাঁদের মধ্যে কে যে প্রকৃত বামপন্থী এবং কে-ই বা নন, কী করে তা আমরা স্থির করব?

ভারতীয় জীবনের বর্তমান রাজনৈতিক পর্যায়ে বামপন্থা বলতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা বোঝায়। রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় (মহাত্মা গান্ধীবর্ণিত স্বাধীনতার সারমর্ম নয়) এবং স্বাধীনতালাভের উপায়-হিসেবে আপোষহীন জাতীয় সংগ্রামে যিনি বিশ্বাসী, তিনিই প্রকৃত বামপন্থী। রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর বামপন্থা বলতে সমাজতন্ত্র বোঝাবে এবং সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর জাতীয় জীবন পুনর্গঠনই হবে তখন জনসাধারণের কর্তব্য। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্ভব নয়।

প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অর্থাৎ বামপন্থীকে সদাসর্বদাই দ্বিমুখী সংগ্রাম চালাতে হয়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। একদিকে তাঁদেরকে এখানে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্রবর্গের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষরফায় প্রস্তুত দুর্বল জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ দক্ষিণ-পন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। সুতরাং প্রকৃতই যাঁরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পরিচিত অনুচরবর্গের হাতেই শুধু নয়—

দক্ষিণপন্থী বন্ধুদের হাতেও তাঁদের নিগৃহীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন্ নিগ্রহটা যে বেশী কঠোর ও মারাত্মক হবে, সেটা বলাও শক্তসাধ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। বর্তমান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বামপন্থীদের উপর অত্যাচার চালাবার ব্যাপারে দক্ষিণপন্থীরা কোনওরকমের নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বনেই দ্বিধা করবেন না। তার কারণ একবার তাঁরা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন। এবং সর্বপ্রকার বিরোধিতাকে দমন করে ভবিষ্যতে সেই ক্ষমতার উপর নিজেদের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতেই তাঁরা বদ্ধপরিকর।

যুগপৎ দুই রণাঙ্গনে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এবং উল্লিখিত দু-তরফা নিগ্রহের সম্মুখীন হওয়া বড় সহজ নয়। এমন অনেকে আছেন একই সময়ে দু-তরফা নিগ্রহ সহ্য করতে যাঁরা সমর্থ নন, একপক্ষেরই মাত্র নিগ্রহ তাঁরা সহ্য করতে পারেন। আবার অনেকে আছেন, বিদেশী সরকারের অত্যাচারকে তাঁরা ভয় করেন না, অথচ দক্ষিণপন্থী বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে তাঁরা অত্যন্তই ভীত। কিন্তু সত্যিই যদি আমরা প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হই এবং সেই হিসেবেই কাজ চালাতে চাই তাহলে একইসঙ্গে উভয় রণাঙ্গনে সংগ্রাম চালাবার এবং সম্ভাব্য সর্বপ্রকার নিগ্রহের সম্মুখীন হবার মত সাহস আমাদের অর্জন করতে হবে।

ভারতবর্ষে এমন সমস্ত লোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে নিজেদেরকে যারা বামপন্থী বলে পরিচয় দেয়। এরা সব লম্বাচওড়া কথা বলে। সমাজতন্ত্রের কথাও বাদ যায় না। কিন্তু সংগ্রামের সম্মুখীন হলেই এরা তার দায়িত্ব এড়িয়ে যায় এবং আত্মপক্ষসমর্থনে ছলচাতুরিপূর্ণ সব যুক্তি খুঁজে নেয়। এই হলো গিয়ে ছদ্ম-বামপন্থীদের পরিচয়। এরা এতই কাপুরুষ যে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামকে এরা এড়িয়ে চলে। অতঃপর আত্মপক্ষ সমর্থনে এরা বলে যে, মিঃ উইনস্টন চার্চিলই (যাঁকে আমরা একজন ঝানু সাম্রাজ্যবাদী বলে জানি) হলেন গিয়ে একালের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। ব্রিটিশ সরকার বর্তমানে নাৎসী ও ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে যুদ্ধনিরত; এই কারণে ব্রিটিশ সরকারকে একটি বিপ্লবী শক্তি বলে আখ্যাত করা আজ এই ছদ্ম-বামপন্থীদের একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ব্রিটেনের এই যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী দিকটাকে এরা বেমালুম ভুলে যায়। ভুলে যায় যে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিপ্লবী শক্তি সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ নাৎসী সরকারের সঙ্গে চুক্তি-বদ্ধ।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে যাঁরা প্রস্তুত, অথচ দক্ষিণ-পন্থীদের সঙ্গে সংঘাতের ভয়ে যাঁরা সন্ত্রস্ত, তাঁদের যুক্তি আলাদা। ঐক্যের অজুহাতের আড়ালে নিজেদের দুর্বলতাকে তাঁরা গোপন করতে চান। কিন্তু

এ-অজুহাত দৃশ্যতঃ সুন্দর হলেও মাঝে মাঝে এটা আত্মপ্রবঞ্চনারই সামিল হয়ে দাঁড়ায়। সকলেরই বোঝা উচিত যে, ঐক্য হয় দু ধরণের। এক ধরণের ঐক্য কাজকে সুসাধ্য করে তোলে, অন্য ধরণের ঐক্য অকর্মণ্যতার প্রশ্রয় দেয়। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। এ-কথাও কারুর বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধীদের সঙ্গে যাঁরা প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নন তাঁদের ঐক্য স্থাপিত হওয়া অসম্ভব। ঐক্যই যদি সর্বাবস্থায় আমাদের লক্ষ্যবস্তু হয় তাহলে যাঁরা কংগ্রেসবহির্ভূত অথবা কংগ্রেসের বিরোধী, কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে তাঁদের ঐক্যস্থাপনের জন্যেই বা চেষ্টা করা হবে না কেন? ঐক্যের যুক্তি নিয়ে খুব বেশী বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক নয়। ঐক্য জিনিসটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তার জন্য আদর্শ ও নীতির একটা মিল থাকা চাই। যে-ঐক্যের জন্য আপন আদর্শ অথবা বিশ্বাসকে বিসর্জন দিতে হয় সে-ঐক্য মূল্যহীন। সে-ঐক্য অকর্মণ্যতারই প্রশ্রয় দেয়। পক্ষান্তরে প্রকৃত ঐক্য সর্বসময়েই শক্তির উৎসস্বরূপ; সে-ঐক্য কর্মপ্রেরণার সঞ্চার করে। ঐক্যের অজুহাতে দক্ষিণ-পন্থীদের সঙ্গে সঙ্ঘাত এড়িয়ে যাওয়াটা দুর্বলতা ও কাপুরুষতারই পরিচায়ক।

যে-কথা এখানে বলা হলো তাতে করে কে প্রকৃত বামপন্থী এবং কে নন, সেটা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হওয়া উচিত। ফরওয়ার্ড ব্লক তার কাজ ও আচরণের মাধ্যমে নিজেকে একটি প্রকৃত বামপন্থী সংস্থা বলে প্রমাণ করতে পেরেছে কি না তা-ও এবারে বুঝতে পারা সহজসাধ্য হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে শেষপর্যন্ত বামপন্থী-সংহতি সাধন সম্ভব হয়ে উঠবে? বামপন্থী-সংহতিসাধনের তিনটি সম্ভাব্য উপায় যে ব্যর্থ হয়েছে, ইতিপূর্বে তা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও দল যে নিজেদের বামপন্থী বলে দাবী করে থাকেন তা-ও আমরা জানি। ভবিষ্যতে কীভাবে তাহলে বামপন্থী আন্দোলন গড়ে উঠবে?

এ-প্রশ্নের উত্তর হলো এই যে, প্রকৃত বামপন্থী কারা, ইতিহাসই তা একদিন প্রমাণ করবে। ইতিহাসই একদিন আসল আর নকলের—ছদ্ম-বামপন্থী আর প্রকৃত-বামপন্থীর পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে। প্রকৃতই যাঁরা বামপন্থী সেদিন তাঁরা একত্রিত হবেন, সেদিন তাঁদের মিলন ঘটবে। এই স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বামপন্থী-সংহতি সম্ভব হয়ে উঠবে। তদুদ্দেশ্যে দ্বিমুখী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁদের একটা অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবার প্রয়োজন অপরিহার্য। এ-পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হবেন তাঁরাই প্রকৃত বামপন্থী। যথা-সময়ে তাঁরা একত্রবদ্ধ হবেন।

ভারতীয় জনসাধারণ একটা সজীব জাতি; এ-কারণে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের কখনও মৃত্যু ঘটতে পারে না। দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে ওদিকে জড়তা প্রবেশ করেছে। প্রগতিকে অব্যাহত রাখবার জন্যই তাই একটা বড়-রকমের বামপন্থী আন্দোলনের প্রয়োজন। প্রয়োজনটা ঐতিহাসিক। তাতে করে সংঘর্ষ অনিবার্য, কিন্তু দুদিন পরেই তার অবসান ঘটবে। দেশের সমগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের উপরেই শেষপর্যন্ত বামপন্থী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ফরওয়ার্ড ব্লক তার জন্মাবধিই ভারতবর্ষে বামপন্থী আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যকলাপের দরুণ কিষাণ-সভার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্যান্য বামপন্থী শক্তিগুলিও দিনে দিনে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ভবিষ্যতে বামপন্থী-সংহতি সাধনের কৃতিত্ব বহুলাংশেই ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাপ্য হবে। যুগপৎ উভয় রণাঙ্গনে নির্ভীকভাবে সংগ্রাম চালিয়ে, এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় দক্ষিণপন্থীদের দু-তরফা নিগ্রহের সম্মুখীন হয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রমাণ করেছে যে এটি একটি প্রকৃত বামপন্থী সংস্থা। অন্যান্যেরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, ফরওয়ার্ড ব্লক সেখানে সাফল্যমণ্ডিত।

দক্ষিণপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে গান্ধীপন্থীদের যে সম্পর্ক, বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পর্কও ঠিক তা-ই। দার্শনিক ভাষায় বলা যায়, ফরওয়ার্ড ব্লককে গান্ধীপন্থীদের "প্রতি-ক্রিয়া" (anti-thesis) বলে গণ্য করা যেতে পারে। ফরওয়ার্ড ব্লক সর্বসময়েই গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রণ্টে কাজ করতে চেয়েছে বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-দুয়ের মধ্যে গভীর ও মৌল পার্থক্য বর্তমান। গান্ধীবাদী পন্থা অবলম্বন করলে শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হবার প্রয়োজন হবে। তার কারণ, আপোষ-মীমাংসাই হলো গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহের (অথবা আইন-অমান্যের) শেষ পরিণতি। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনওপ্রকার সংস্রব রাখতেই সম্মত নয়। সামাজিক দিক থেকে দেখতে গেলেও দেখা যাবে যে, গান্ধীবাদের সঙ্গে "বিত্তবান"দের—কায়েমী স্বার্থের—একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু অনিবার্যভাবেই "বিত্তহীন"রা আজ শ্রেণীসচেতন হয়ে উঠছে; এ-কারণে গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই কারণেই দেখা যায় যে, কিষাণ ও কারখানা-শ্রমিক অথবা দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত যুব-সমাজ ও ছাত্রদের মধ্যে গান্ধীবাদ আর আজ কোনও সাড়া জাগাতে পারছে না। কুড়ি বছর আগের তুলনায় অবস্থা আজ

পালটে গিয়েছে। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনকার্য সম্পর্কে গান্ধীবাদী পরিকল্পনা অংশতঃ মধ্যযুগীয় এবং অংশতঃ সমাজবিরোধী। ফরওয়ার্ড ব্লকের পরিকল্পনার সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। ব্লকের পরিকল্পনা সর্বাংশে আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীসম্পন্ন; সামাজিক পুনর্গঠনই তার আদর্শ।

ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৯ সনের মে মাসে। তারপর থেকে—স্বাভাবিকভাবেই—এর আদর্শ ও কর্মসূচীর আরও অনেক প্রসার ঘটেছে। তবে মূলনীতিসমূহের কোনও পরিবর্তন হয়নি। শুধুমাত্র একটি বিষয় ছাড়া। সেটি হলো এই যে, ১৯৪০ সনের জুন মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পার্টি বলে ঘোষণা করা হয়। আগের মতই আজও এই সংস্থা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপোষহীন জাতীয় সংগ্রামে বিশ্বাসী এবং সংগ্রামোত্তর কালে সামাজিক পুনর্গঠনই এর আদর্শ।

এযাবৎ ফরওয়ার্ড ব্লক কী কী সাফল্য অর্জন করেছে, এবং এর ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাই বা কী, তা নিয়ে এখানে প্রশ্ন ওঠা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিছুমাত্র আত্মপ্রশংসা অথবা অত্যুক্তি না করে আমরা নিম্নলিখিত দাবীগুলি করতে পারিঃ—

(১) দক্ষিণপন্থীদের কাজের ফলে কংগ্রেসের গতিশক্তিহীন হয়ে পড়বার এবং মৃত্যুকবলিত হবার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, বামপন্থী শক্তি গড়ে তুলে ফরওয়ার্ড ব্লক তার হাত থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করেছে। এইভাবেই সে বহুলাংশে তার ঐতিহাসিক ভূমিকার সার্থকতা প্রমাণ করেছে।

(২) নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে ক্রমাগ্রগতির পথরোধ, জনসাধারণের মধ্যে এক নূতন বৈপ্লবিক মনোভাব সৃষ্টি, এবং কংগ্রেসকে—যতোই না কেন অল্পপরিমাণে হোক—সংগ্রামের পথে ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে ফরওয়ার্ড ব্লক সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আজ আর কেউ এ-সত্য অস্বীকার করবেন না যে, ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে রামগড়ে যে আপোষবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ফরওয়ার্ড ব্লক কর্তৃক তার পূর্বে যে-প্রচার ও পরে যে-সমস্ত কাজ চালিয়ে যাওয়া হয় তারই দরুণ মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

(৩) যুদ্ধ সম্পর্কে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(৪) ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধী যুদ্ধ সম্পর্কে যে-নীতি অবলম্বন করেছিলেন সেই নীতি বর্জন করে তাঁরা যে ১৯২৭ সন থেকে ১৯৩৮ সন পর্যন্ত কংগ্রেস যুদ্ধ-সম্পর্কে যে-নীতি প্রচার করে এসেছে পুনরায় সেই নীতি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হন, ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রচার ও কার্যকলাপই তার জন্য দায়ী।

(৫) যে-সমস্ত কারণে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলবার ব্যাপারে ফরওয়ার্ড ব্লক সেই কারণগুলিকে পরিষ্কারভাবে বিবৃত করেছে, এবং কংগ্রেসের ভাবগত ও আদর্শগত অগ্রগতির মূলে শক্তিসঞ্চার করেছে।

(৬) কোনও ব্যক্তি অথবা দল যাতে কোনও ব্যাপারে, বিশেষতঃ যুদ্ধ-সংকট ও জাতীয়-সংগ্রামের ব্যাপারে পিছিয়ে না পড়ে, তার জন্য কংগ্রেস ও দেশকে সতর্ক করে দেবার উদ্দেশ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক এক সতর্ক-প্রহরীর ভূমিকায় কাজ করে যাচ্ছে।

ভবিষ্যতের সম্পর্কেও প্রত্যয়ের সঙ্গেই এ-কথা বলা যেতে পারে যেঃ—

(১) ভবিষ্যৎকালে কংগ্রেসের অগ্রগতি যাতে অব্যাহত থাকে, ফরওয়ার্ড ব্লক তার জন্য যথাসময়েই কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সফল হবে।

(২) ভবিষ্যৎকালের দল হিসেবে ফরওয়ার্ড ব্লক তার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণ করবে। এই দলের নেতৃত্বেই জাতীয় আন্দোলন চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করবে, এবং তারপর এই দল জাতীয় পুনর্গঠনের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এই দল জন্মলাভ করেছে। পারিপার্শ্বিক ও বহির্জগতের যা-কিছু শুভ ও কল্যাণকর তা গ্রহণ করবার মত শক্তিও এই দলের বর্তমান। এই কারণেই এই দল জাতীয় সংগ্রামকে তার লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালনা এবং স্বাধীনতা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে এক নবভারত গঠন, এই দ্বিবিধ দায়িত্বপালনে সক্ষম হবে।

(৩) আপন দায়িত্ব পালন করে এই দল জগৎসভায় ভারতবর্ষকে পুনরায় তার যোগ্য ও ন্যায়সঙ্গত আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

(৪) মানব-প্রগতিকে আরও কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে দেবার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে যে ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন, এই দল ভারতবর্ষকে সেই ভূমিকা-গ্রহণে সক্ষম করে তুলবে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যদের হৃদয়ে বর্তমানে যে-সমস্ত ভাবনাধারণা

সর্বাধিক গুরুত্বলাভ করেছে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা যেতে পারেঃ—

ফরওয়ার্ড ব্লকের আদর্শ হলোঃ—

(১) পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা, এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম।

(২) সম্পূর্ণরূপে আধুনিক ও সমাজবাদী রাষ্ট্র।

(৩) দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় ব্যাপক শিল্পোৎপাদন।

(৪) উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ।

(৫) ধর্মোপাসনার ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

(৬) সকলের জন্য সমান অধিকার।

(৭) ভারতীয় সমাজের সর্বশ্রেণীর ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা।

(৮) স্বাধীন ভারতে নববিধান গঠনে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার-নীতির প্রয়োগ।

ফরওয়ার্ড ব্লক একটি বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন ও গতিশক্তিশীল প্রতিষ্ঠান। এই কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কতকগুলি বাঁধাধরা বুলি অথবা রাজনীতি কিংবা অর্থনীতির কতকগুলি ধরতাই আদর্শকে আঁকড়ে থাকা সম্ভব নয়। বহির্জগৎ থেকে জ্ঞানাহরণ এবং অন্যান্য প্রগতিশীল রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে লাভবান হতেই এই প্রতিষ্ঠান উৎসুক। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রগতি অথবা বিবর্তনের শাশ্বত নীতিতে আস্থাশীল; এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করে যে, এ-ব্যাপারে ভারতবর্ষেরও অনেক কিছু দান করবার রয়েছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যয়ের সঙ্গেই এ-কথা আমরা বলতে পারি যে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনের থেকেই যদি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়ে থাকে তবে এর মৃত্যু অসম্ভব। এর অস্তিত্বের দার্শনিক কোনও যৌক্তিকতা যদি থেকে থাকে তো নিশ্চয়ই এ-প্রতিষ্ঠান টিঁকে থাকবে। এই প্রতিষ্ঠান যদি ভারতবর্ষ, মানবতা ও মানব-প্রগতির কল্যাণসাধন করে তবে সে বেঁচে থাকবে ও বিকাশলাভ করবে। পৃথিবীর কোনও শক্তিই সেক্ষেত্রে তাকে ধ্বংস করতে পারবে না।

দেশবাসীর নিকট আমার আবেদন, এই শাশ্বত অগ্রগতিই তাঁদের আদর্শ হোক!

শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসুর সৌজন্যে।

(৩)

ভারতবর্ষের মূল সমস্যা

[**প্রকাশকের বক্তব্য:** ১৯৪৪ সনের নবেম্বর মাসে টোকিয়ো ইম্‌পীরিয়্যাল য়ুনিভার্সিটির ছাত্রদের উদ্দেশে নেতাজী এক বক্তৃতা দেন। বর্তমান প্রবন্ধটি সেই বক্তৃতারই একটি অংশ। "আমার দেশ আজ মৌলিক যে-সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন, এবং ভবিষ্যতেও তাকে যে-সমস্ত মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে" সেই সম্পর্কেই নেতাজী এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের একটি আদর্শ-রূপ এখানে পরিকল্পনা করা হয়েছে। নেতাজী এই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ব্যবস্থার সমন্বয়স্বরূপ একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবনই আমাদের কর্তব্য হবে।"]

আপনাদের কাছে আমি ভারতবর্ষের মৌলিক সমস্যাসমূহের কথা বলছি। নিজে আমি দর্শনের ছাত্র; এ-কারণে মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে আমি অধিকতর আগ্রহশীল।

বিদেশ ভ্রমণকালে মাঝে মাঝে আমি লক্ষ্য করেছি যে, বাইরের লোকের মনে আমার দেশ সম্পর্কে একটা ভুল ও অদ্ভুত ধারণা বর্তমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইউরোপের অধিকাংশ লোকের মনেই এই ধারণা বর্তমান যে, ভারতবর্ষে শুধু তিনটি জিনিস দেখতে পাওয়া যায়—সাপ, ফকির আর মহারাজা। ব্রিটিশ প্রচার-কার্যের দ্বারা যারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের ধারণা, ভারতবর্ষের অধিবাসীরা সদা-সর্বদা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরছে এবং জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থেই সেখানে ব্রিটেনের কঠোর শাসনদণ্ডের প্রয়োজন বর্তমান।

আবার ইউরোপের প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অর্থাৎ ভারততত্ত্ব-বিশেষজ্ঞদের কাছে গেলে দেখতে পাবেন যে, ভারতবর্ষকে তাঁরা মরমী ও দার্শনিকদের সাধনভূমি বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, ভারতবর্ষে এককালে একটি সমৃদ্ধ দর্শনতত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল, কিন্তু মিশর ও ব্যাবিলনের প্রাচীন সভ্যতার মতই সে-সভ্যতাও আজ মৃত।

এখন প্রশ্ন হলো, "ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থাটা তাহলে কী?" আমাদের সভ্যতা যে অত্যন্তই সুপ্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই, তবে অন্যান্য দেশ—যথা মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া এমনকি গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার মত ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মৃত্যু ঘটে নি। ভারতবর্ষের সভ্যতা আজও বেঁচে আছে। দু' হাজার অথবা তিন হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে

চিন্তা, অনুভূতি ও জীবনাদর্শের অধিকারী ছিলেন, মূলতঃ আজও আমরা সেই একই চিন্তা, অনুভূতি ও জীবনাদর্শের অধিকারী। অন্য কথায় বলতে পারা যায় যে, সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগসূত্র বর্তমান। ইতিহাসে এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা। এখন ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করতে হলে এই মৌলিক সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে যে, অতীতের সেই ভারতবর্ষের মৃত্যু ঘটেনি। অতীতের সেই ভারতবর্ষ বর্তমানকালের মধ্যে জীবিত রয়েছে, ভবিষ্যৎকালের মধ্যেও থাকবে।

এই পটভূমিকা, এই সুপ্রাচীন পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতেই যুগে যুগে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে দেখতে পাই। বিগত তিন হাজার বছর ধরে নূতন নূতন ভাবধারা, কখনো কখনো বা নব নব সংস্কৃতি সঙ্গে করে বহির্জগতের অধিবাসীরা ভারতবর্ষে এসে প্রবেশ করেছে। এই নূতন প্রভাব, নূতন ভাবধারা ও নূতন সংস্কৃতি কালক্রমে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। এবং এই কারণেই, মূলতঃ যদিও আমরা সহস্র সহস্র বছর পূর্বের সেই একই সংস্কৃতি ও সভ্যতার উত্তরসাধক, আমাদের মধ্যে পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে; সময়ের সঙ্গে তাল রেখেই আমরা সামনে এগিয়ে চলেছি। ঐতিহ্য প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও আজ আমরা তাই আধুনিক পৃথিবীতে জীবনধারণ করতে ও তার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ।

জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ ব্রিটিশ প্রচারকার্যের দ্বারা যাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের ধারণা, অতি সহজেই ব্রিটিশ-শক্তি ভারতবর্ষকে জয় করে নিয়েছিল এবং ব্রিটিশ-শক্তির ভারতাধিকারের পরে আমাদের দেশ এই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রিক ঐক্য লাভ করেছে। দুটি ধারণাই ভুল এবং ভিত্তিহীন।

প্রথমতঃ, ব্রিটিশ-শক্তি যে সহজেই ভারতজয়ে সক্ষম হয়েছিল এ-কথা সত্য নয়। ভারতবর্ষকে চূড়ান্তভাবে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে ব্রিটিশ-শক্তির ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭, এই একশো বছর সময় লেগেছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ-শক্তি ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রিক ঐক্য এনে দিয়েছে, এ-কথা মনে করাও সম্পূর্ণ ভুল। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রিক ঐক্য লাভ করে। বস্তুতঃ, অশোকের ভারতবর্ষের আয়তন ছিল আজকের ভারতবর্ষের অপেক্ষাও বড়। অশোকের সময়ে ভারতবর্ষ বলতে শুধু আজকের ভারতবর্ষকেই বোঝাত না, আফগানিস্থান এবং পারস্যের একাংশও অশোকের ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অশোকের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বহু উত্থানপতন

ঘটেছে। কখনো-বা অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, কখনো-বা অগ্রগতি ও জাতীয় অভ্যুদয়। তবে জাতীয় জীবনের এই পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত বরাবরই আমরা আমাদের প্রগতিকে অব্যাহত রাখতে পেরেছি। অশোকের প্রায় এক হাজার বৎসর পরে গুপ্ত-সম্রাটদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ পুনর্বার প্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। তার প্রায় ন'শো বৎসর পরে মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে ভারতীয় ইতিহাসে আর-একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। সুতরাং মনে রাখা দরকার, ব্রিটিশ শাসনাধীনে যে আমরা রাষ্ট্রিক ঐক্যলাভ করেছি, ব্রিটিশদের এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। ভারতশাসনকালে ব্রিটিশ-শক্তি শুধু ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করে তাদের দুর্বল, নিরস্ত্র ও নির্জীব করে রাখতেই চেষ্টা করেছে।

এখন আপনাদের সম্মুখে আমি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করছি। বৈজ্ঞানিকরা, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্ররা এ-প্রশ্নে কৌতূহল বোধ করবেন। প্রশ্নটা হলো এই যে, একটি স্বাধীন জাতিহিসেবে বেঁচে থাকবার অধিকার ভারতীয় জনসাধারণের আছে কি না। কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করা যায়, স্বাধীন জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবার ও নিজেদের গড়ে তুলবার মতো শক্তি ও সামর্থ্য কি তাদের অবশিষ্ট আছে? আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো এই যে, কোনও জাতির প্রাণশক্তি—তার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি—যদি একবার নষ্ট হয়ে যায় তো নিজের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখবার কোনও অধিকার আর তার থাকতে পারে না। প্রাণশক্তি হারাবার পরেও যদি সে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখে তো মানবতার কাছে তার সেই অস্তিত্ব সম্পূর্ণই মূল্যহীন। আমি বিশ্বাস করি, স্বাধীনভাবে জীবনধারণ এবং স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মগঠনের জন্য যে-প্রাণশক্তির প্রয়োজন, এখনো আমাদের মধ্যে সেই প্রাণশক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। আমি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাই, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে আমি যে বিশ্বাস পোষণ করি, সে শুধু এই কারণেই।

এখন, আমাদের মধ্যে পর্যাপ্ত প্রাণশক্তি রয়েছে কি না এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাকে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রথমতঃ, জাতিহিসেবে আমাদের মধ্যে সৃজনশীল কার্যক্ষমতা আছে কি না, এবং দ্বিতীয়তঃ, নিজেদের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য আমরা সংগ্রাম করতে ও মৃত্যুবরণে প্রস্তুত আছি কি না। এই দুটি পরীক্ষার মাধ্যমেই ভারতবর্ষকে বিচার করে দেখতে হবে।

প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শক্তির অস্তিত্ব এবং বিদেশী শাসনব্যবস্থার সৃষ্ট অসংখ্য বিধিনিষেধ ও অসুবিধা সত্ত্বেও গত

একশো বছরে এ-কথা আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও আমরা সৃজনশীল কার্যক্ষমতার অধিকারী।

ব্রিটিশশাসনের অধীন থেকেও ভারতবর্ষ যে-সমস্ত দার্শনিক ও চিন্তা-নায়কের জন্মদান করেছে, দাসত্বশৃংখলে আবদ্ধ থেকেও ভারতবর্ষ যে-সমস্ত লেখক ও কবি সৃষ্টি করেছে, ব্রিটিশশাসনাধীন ভারতবর্ষেও শিল্পকলার যে পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে অসংখ্য অসুবিধাসত্ত্বেও ভারতীয় জনসাধারণ বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে যে-অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের নেতৃস্থানীয় বৈজ্ঞানিকরাও ইতিমধ্যেই যে সাফল্য অর্জন করেছেন, আপন চেষ্টা ও উদ্যোগে শিল্পক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ আজ যে-পরিমাণে সামনে এগিয়ে এসেছে, সর্বশেষে ক্রীড়াক্ষেত্রেও আমরা যে সম্মান অর্জন করেছি, তাতে করে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, রাজনৈতিক পরাধীনতা সত্ত্বেও জাতিহিসেবে আমাদের প্রাণশক্তি এখনো সম্পূর্ণ অটুট।

বিদেশী শাসনের অধীনে থেকেই—এবং বিদেশী শাসনব্যবস্থার সৃষ্ট অসুবিধা ও বিধিনিষেধ সত্ত্বেও—যদি আমরা আমাদের সৃজনশীল কার্যক্ষমতার এতখানি পরিচয় দিয়ে থাকতে পারি তবে যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলতে পারা যায় যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয় জনসাধারণ যখন শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত সুযোগসুবিধা লাভ করবে তখন জীবনের নানাক্ষেত্রে তারা তাদের মনীষা ও সৃজনশীলতার আরও প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে সমর্থ হবে।

জাতির প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ আছে কি না সে-বিষয়ে আমি প্রথম প্রমাণের অর্থাৎ তার সৃজনশীল ক্ষমতার উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় প্রমাণ, অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতীয় জনসাধারণ সংগ্রাম করতে ও মৃত্যুবরণে প্রস্তুত আছে কিনা, এবারে সেই সম্পর্কেই আমি আলোচনা করব। সর্বপ্রথমেই আমি বলে নিতে চাই, ১৮৫৭ সনে ভারতীয় জনসাধারণ ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে যে শেষ মহান্ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তারা তাদের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে একদিনের জন্যেও যুদ্ধ বন্ধ করে রাখে নি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, ১৮৫৭ সনে আমাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর তৎকালীন নেতৃবৃন্দ নিরস্ত্রীকরণ-ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিলেন। এটা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের একটা মারাত্মক ভুল। স্বাধীনতা ফিরে পাবার ব্যাপারে পরবর্তীকালে আমাদের যে-সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, এই নিরস্ত্রীকরণ-ব্যবস্থাই তার জন্য বহুলাংশে দায়ী। তবে নেতৃবৃন্দের ভুলের দরুণ জনসাধারণকে নিরস্ত্র করা গেলেও অন্যান্য উপায়ে তারা তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনার ব্যাপারে যে-সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার সবগুলির একটা বিশদ বর্ণনা দিয়ে অযথা আমি আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। এইটুকুই শুধু আমি বলব যে, স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সমস্ত উপায়ে সংগ্রাম চালানো হয়েছে, ভারতবর্ষ তার কোনওটিকেই বাদ দেয় নি।

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে, বিশেষ করে ১৯০৪ ও ১৯০৫ সনে জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় ঘটবার পর, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে এক নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। তারপর থেকে গত চল্লিশ বছর ধরে আমাদের বিপ্লবীরা ঘনিষ্ঠভাবে অন্যান্য দেশের বিপ্লবীদের কার্যপন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করেছেন।

দেশের মধ্যে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ তৈরি করবার এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সেই-সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক ব্যবহারের জন্যও তাঁরা চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিবর্তিত পর্যায়ে ভারতবর্ষ একটা নূতন উপায় পরীক্ষা করে দেখেছে। তা হলো আইন-অমান্য। মহাত্মা গান্ধী এর প্রবর্তন করেন। ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য আমি বিশ্বাস করি যে, এ-উপায়ে পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। তবে ভারতীয় জনসাধারণকে জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করতে এবং বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনকে অব্যাহত রাখবার ব্যাপারে যে এ-উপায় যথেষ্টই সহায়ক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বিদেশী শাসনজনিত সর্বপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও যে একটি জাতি নূতন-এক-সংগ্রাম-ব্যবস্থার উদ্ভাবনে এবং কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগের ব্যাপারে যথেষ্ট-পরিমাণে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, এটাও তার প্রাণশক্তিরই পরিচায়ক। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, দাসত্বকে সে-জাতি একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা বলে মেনে নেয়নি। দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নব নব পন্থার উদ্ভাবন করতেই সে কৃতসংকল্প।

নিজে একজন বিপ্লবী হিসেবে আমি ঘনিষ্ঠভাবে অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনসমূহ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি না করেই আমি বলতে পারি, ১৮৫৭ সন থেকে আমরা বৈপ্লবিক সংগ্রামের সম্ভাব্য সর্ব-প্রকার পন্থাই অবলম্বন করেছি। এ-সংগ্রামে আমাদের যে ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে তা অসাধারণ; অসংখ্য দেশবাসী এ-সংগ্রামে প্রাণবিসর্জন দিয়েছেন। একটিমাত্র পন্থাই শুধু আমাদের অবলম্বন করতে বাকি ছিল; তা হলো প্রকৃত অর্থে আধুনিক কালোপযোগী একটি জাতীয় বাহিনী গঠন।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও এ-কাজ আমরা করতে পারিনি; ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিশবাহিনীর সামনে বসে এ-কাজ করা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু যে-মুহূর্তে এই মহাযুদ্ধ ভারতীয় জনসাধারণকে ভারতবর্ষের বাইরে আধুনিক কালোপযোগী একটি ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সংগঠনের সুযোগ এনে দিয়েছে, তন্মুহূর্তেই সেই সুযোগের তারা সদ্ব্যবহার করেছে।

ব্রিটিশ সরকার ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামের সর্বপর্যায়েই আমরা যথেষ্টপরিমাণে কর্মোদ্যোগ, সৃজনশীল ক্ষমতা ও প্রাণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছি; অবর্ণনীয় ত্যাগস্বীকারেও আমরা কুণ্ঠিত হইনি। এই আশাই এখন আমরা পোষণ করছি যে বর্তমানে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার সহায়তায় এবং এ-যুদ্ধ আমাদের যে সুবিধে এনে দিয়েছে তার সদ্ব্যবহার করে শেষপর্যন্ত এবারে আমরা আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদান করতে এবং ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করতে সমর্থ হব।

ভারতীয় জনসাধারণের প্রাণশক্তি এবং স্বাধীন জাতিহিসেবে জীবনধারণের অধিকারের কথা বলা হলো। এবারে আমি ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার একটা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করছি। বর্তমান ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করতে হলে তিনটি বিষয় আপনাদের মনে রাখতে হবে। প্রথমটি হলো তার সুপ্রাচীন পটভূমিকা, অর্থাৎ তার প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা। বর্তমান ভারতবর্ষের জনসাধারণ সেই সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে সচেতন এবং এ-নিয়ে তারা গর্বও বোধ করে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। ব্রিটিশ-শক্তির কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হবার পর থেকে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে আমরা এই সংগ্রাম চালিয়ে এসেছি। তৃতীয় বিষয়টি হলো, ভারতবর্ষের উপর বাহিরের প্রভাব।

সুপ্রাচীন পটভূমিকা, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন জাতীয় সংগ্রাম, এবং বহির্বিশ্বের প্রভাব,—এই তিনের ভিত্তিতেই বর্তমান ভারত গড়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের উপরে বহির্বিশ্বের যে-সমস্ত প্রভাব এসে পড়েছে এবং ভারতবর্ষের বর্তমান রূপগঠনে অংশতঃ যা কার্যকরী হয়েছে, এবারে সেই সম্পর্কেই আমি সবিস্তারে আলোচনা করছি। বহির্বিশ্বের এই-সমস্ত প্রভাবের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার—উদারনৈতিক, নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে যার বিকাশ ঘটেছে—প্রভাবই হলো প্রধানতম।

কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে পারা যায়, ১৮৫৭ সনের পর থেকে আধুনিক উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ভাবধারাই ভারতীয় বুদ্ধিবাদীদের প্রভাবিত করে এসেছে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে আর-একটি লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ১৯০৪—১৯০৫ সনে জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় ঘটবার পর এশিয়ায় এক নূতন আন্দোলনের প্রতি ভারতীয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এ-আন্দোলন শুধুমাত্র জাপানের নয়, জাপানের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার অন্যান্য দেশেরও পুনরভ্যুত্থানের আন্দোলন। তখন থেকেই ভারতবর্ষ গভীর অভি-নিবেশ সহকারে এশিয়ার পুনরভ্যুত্থান সম্পর্কে চিন্তা করে এসেছে। গত চল্লিশ বছর ধরে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের ঘটনাবলী সম্পর্কেই নয়, এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের ঘটনাবলী সম্পর্কেও আমরা চিন্তা করে আসছি।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের বৈপ্লবিক সংগ্রামও এই সময়ে আমাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর নেতৃত্বে ইতালীতে যে রিসর্জিমেণ্টো আন্দোলন চলেছিল ভারতীয় বিপ্লবীরা সেই আন্দোলন ও ব্রিটিশ নিপীড়কদের বিরুদ্ধে আইরিশ জন-সাধারণের সংগ্রাম-পদ্ধতি গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখেন। গত মহাযুদ্ধের আগে রাশিয়াতে জারের বিরুদ্ধে যে নিহিলিস্ট আন্দোলন চলেছিল তার কথা আপনারা জানেন। এই আন্দোলনের প্রকার-পদ্ধতিও অনুধাবন করে দেখা হয়। ভারতবর্ষের নিকটে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনের যে নবজাগরণ ঘটে, ভারতীয় বিপ্লবীরা গভীর আগ্রহসহকারে সে-সম্পর্কেও চিন্তা করে দেখলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বহির্বিশ্বের বৈপ্লবিক সংগ্রামসমূহে যে প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল, ভারতীয় বিপ্লবীরা সর্বান্তঃকরণেই তাকে গ্রহণ করেছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়াতে বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটল, বিপ্লবের ফলে সেখানে এক নূতন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই গবর্ণমেণ্টের কার্যাবলীও আমাদের দেশে সাগ্রহে বিচার-বিবেচনা করে দেখা হয়েছে।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ সোভিয়েট রাশিয়ার পুনর্গঠনকার্য, সেখানকার দ্রুত শিল্পপ্রসারপদ্ধতি এবং যে-উপায়ে সোভিয়েট সরকার সংখ্যালঘু-সমস্যার সমাধান করেছেন সে-সম্পর্কে যতখানি আগ্রহশীল, কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে ততখানি নয়। আমাদের দেশের জনসাধারণ সোভিয়েট সরকারের এই পুনর্গঠনকার্যের সাফল্য সম্পর্কেই গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে দেখেছে। বস্তুতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনসংক্রান্ত ব্যাপারে সে-দেশ পরিভ্রমণ করতে গিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতীয় চিন্তানায়কেরা সেখানকার কাজ দেখে অত্যন্তই প্রীত হন। অথচ কমিউনিজ্‌ম্‌ সম্পর্কে এঁদের কোনও আকর্ষণ ছিল না। সাম্প্রতিক কালে বহির্বিশ্ব থেকে আরও একটি প্রভাব ভারতবর্ষে এসে পৌঁচেছে। ইতালী ও জার্মাণীর নেতৃত্বে ইউরোপে

ফ্যাসিজ্‌ম্‌ অথবা ন্যাশনাল সোস্যালিজ্‌ম্‌য়ের যে আন্দোলন শুরু হয়, তার কথাই আমি বলছি। ভারতীয় বিপ্লবীরা এই আন্দোলন সম্পর্কেও বিচার-বিবেচনা করে দেখলেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল, যথা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, চীন, রাশিয়া, জার্মাণী ইত্যাদি দেশ থেকে ভারতবর্ষে যে সমস্ত প্রভাব এসে পৌঁচেছে, তারই কয়েকটির কথা এখানে বলা হলো। এ-প্রভাব আমাদের উপরে কতখানি কার্যকরী হয়েছে, এর কতখানি আমরা গ্রহণ ও কতখানি বর্জন করেছি, সেই প্রশ্ন সম্পর্কেই এখন আমি আলোচনা করব।

বহির্বিশ্বের প্রভাব আমাদের উপর কতখানি কার্যকরী হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করবার আগে প্রথমেই আমি বলে নিতে চাই, বিগত যুগ ও বর্তমান যুগের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য বর্তমান। বিগত যুগের দুজন প্রতিনিধি-স্থানীয় পুরুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর নামোল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের কাছে তাঁরা বিগত যুগের প্রতিনিধিস্বরূপ; তাঁদের চিন্তাধারা এবং আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর রচনাবলী পাঠ করলে আপনারা বুঝতে পারবেন, পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবকে কীভাবে গ্রহণ করা উচিত সে-বিষয়ে বরাবরই তাঁদের মনে একটা বিরোধ বর্তমান। মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে বলতে হয়, এ-সমস্যার তিনি কোনও স্পষ্ট সমাধান নির্দেশ করেননি। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা গ্রহণ করা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যে কী, জনসাধারণকে সে-বিষয়ে তিনি একটা সংশয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, এ-ব্যাপারে তিনি বিরোধী-ভাবাপন্ন। তবে কার্যক্ষেত্রে সদাসর্বদা তিনি তাঁর নিজস্ব ভাবধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। তার কারণ হলো এই যে, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও দৃষ্টি-ভঙ্গী সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে বিরোধীভাবাপন্ন হলেও, দেশবাসী এ-ব্যাপারে তাঁর মনোভাবের সমর্থক নয়।

সহিংস নীতি অথবা বাহুবলপ্রয়োগ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব কী, তা আপনারা সকলেই জানেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অস্ত্রব্যবহার অথবা শত্রুর রক্তপাতের তিনি সমর্থক নন। সহিংস নীতি অথবা বাহুবল-প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর এই যে মনোভাব, বহির্বিশ্বের বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের সঙ্গে এর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বর্তমান যুগের মানুষ রাজনৈতিক সংগ্রামের নেতাহিসেবেই মহাত্মা গান্ধীকে অনুসরণ করেছে; তবে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-

ধারাকে তারা সর্বাংশে গ্রহণ করেনি। মহাত্মা গান্ধীকে তাই বর্তমান ভারতের ভাবনা ও চিন্তাধারার মুখপাত্র মনে করলে ভুল করা হবে।

গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে খানিকটা জটিলতা রয়েছে। আপনারা যাতে ভালভাবে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন তার জন্য আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের একটু বিশ্লেষণ করছি। গান্ধীজীর মধ্যে দুটি সত্তা রয়েছে। একদিকে তিনি রাজনৈতিক নেতা, অন্যদিকে দার্শনিক। রাজনৈতিক নেতাহিসেবেই তাঁকে আমরা অনুসরণ করে এসেছি, তবে তাঁর দর্শনকে আমরা গ্রহণ করিনি।

এখন এই দুটি দিককে আলাদা করে দেখা সম্ভব কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাঁর দর্শনকে যদি আমরা না-ই গ্রহণ করে থাকি তো তাঁকে আমরা অনুসরণ করছি কেন? গান্ধীজীর নিজস্ব একটা জীবনদর্শন রয়েছে বটে, কিন্তু রাজনীতিকহিসেবে তিনি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন। একারণে জনসাধারণের উপরে তিনি জোর করে তাঁর দর্শনকে চাপিয়ে দেননি। ফলতঃ, রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করা সত্ত্বেও নিজ নিজ দর্শন অনুসরণের স্বাধীনতাও আমাদের রয়ে গিয়েছে। গান্ধীজী যদি জোর করে আমাদের উপরে তাঁর দর্শনকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন তো নেতাহিসেবে তাঁকে আমরা গ্রহণ করতাম না। তিনি তা করেন নি। রাজনৈতিক সংগ্রামের থেকে তিনি তাঁর দর্শনকে পৃথক করে রেখেছেন।

বিগত যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষ হিসেবে আমি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর নাম করেছি। এবারে তাঁদের দর্শনকে তুলনা করে দেখা যাক। কতকগুলি বিষয়ে তাঁরা একমত, আবার কতগুলি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য বর্তমান। যে-সমস্ত বিষয়ে তাঁরা একমত তার মধ্যে প্রথমটি হলো এই যে, জাতীয় সংগ্রামে অস্ত্রব্যবহার করা না হোক্, এইটেই তাঁদের কাম্য। অর্থাৎ বাহুবলপ্রয়োগ সম্পর্কে তাঁরা একই অভিমত পোষণ করেন। দেশের শিল্পায়ন সম্পর্কেও তাঁদের একই অভিমত। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী—উভয়েই আধুনিক শিল্পসভ্যতার বিরোধী। তবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা একমত নন। চিন্তাধারা, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সংস্কৃতির ব্যাপারে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও আদানপ্রদানের ব্যবস্থা থাকা দরকার। অন্য কোনও দেশের সংস্কৃতি অথবা শিল্পকলা অথবা ভাবধারার প্রতি যেন আমরা বিরোধীভাবাপন্ন না হই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেখানে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের পূর্ণ সহযোগিতার কথা বলেছেন, মোটামুটিভাবে গান্ধীজী সেখানে বৈদেশিক প্রভাবের বিরোধী। তবে এ-প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার

যে, মহাত্মা গান্ধী কোনওখানেই খুব খোলাখুলিভাবে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন নি। এ-ব্যাপারে তাঁর মোটামুটি মনোভাবের কথাই তাই আমি বলেছি।

বিগত যুগের মৌলিক চিন্তাধারা ও এ-যুগের মৌলিক চিন্তাধারার মধ্যে যে একটা বিরাট ব্যবধান বর্তমান, আগেই সে-কথা আমি বলেছি। কথাটার অর্থ এবারে বুঝিয়ে বলছি। বহির্বিশ্বের প্রভাব ও শিল্প-সভ্যতার সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কী হওয়া উচিত, বিগত যুগের নেতৃবৃন্দ আজীবন তা নিয়ে বিব্রত ছিলেন; তাঁদের কাজের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের কাছে কিন্তু এ-সমস্যার কোনও অস্তিত্ব নেই। তার কারণ, গোড়াতেই আমরা ধরে নিয়েছি যে, অতীতের ভিত্তিতেই আমরা এক নবভারত গড়ে তুলতে অভিলাষী। অস্ত্র-ব্যবহার না করে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। এখন একবার যদি ধরে নেওয়া যায়, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে ও অস্ত্রব্যবহার করতে হবে তো তার থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, অস্ত্রোৎপাদনের জন্য আধুনিক শিল্পও আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আধুনিকতার ভিত্তিভূমিকেই আমরা অবলম্বন করতে চাই। পুরাতন নেতৃবৃন্দের কাছে যেটা ছিল বৃহত্তম সমস্যা, সেইখান থেকেই আমরা কাজ শুরু করছি। আধুনিকতা, বহির্বিশ্বের প্রভাব অথবা শিল্পায়ন সম্পর্কে কী মনোভাব অবলম্বন করা হবে, আধুনিক ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা কোনও সমস্যা নয়,—আজকের দিনের সমস্যাগুলির কীভাবে সমাধান করা যায় সেইটিই আমাদের বিবেচ্য।

বিগত যুগের ভারতবর্ষের চাইতে বর্তমান যুগের ভারতবর্ষকেই আধুনিক জাপান আরো ভালো বুঝতে পারবে। আমাদের আদর্শ কার্যতঃ অভিন্ন। পুরাতন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তিতে আমরা এক নূতন ও আধুনিক জাতি গড়ে তুলতে চাই। তার জন্য আমাদের আধুনিক শিল্প, আধুনিক সৈন্য-বাহিনী এবং বর্তমান যুগ-পরিবেশে অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে-সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন তা গড়ে তুলবার দরকার রয়েছে।

এবারে আমি স্বাধীন ভারতের কয়েকটি সমস্যার কথা আলোচনা করছি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভের পরে সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য একটি জাতীয় বাহিনী সংগঠনই হবে আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্রতি-রক্ষার জন্য যে-সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন, তা উৎপাদন করবার জন্য আমাদের আধুনিক যুগোপযোগী অস্ত্রনির্মাণ-শিল্প গড়ে তুলতে হবে। ফলতঃ আমাদের এক বিরাট শিল্পয়ন-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পর ভারতবর্ষকে তার দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধানে ব্রতী হতে হবে। ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশসমূহের অন্যতম। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসবার পূর্বে তার এই দারিদ্র্য ছিল না। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের জন্যই ইউরোপীয় জাতিসমূহ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। জাতীয় ঐশ্বর্য অথবা সম্পদের দিক থেকে ভারতবর্ষকে দরিদ্র বলতে পারা যায় না। আমরা প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রিটিশ ও বৈদেশিক শোষণের ফলে ভারতবর্ষকে দারিদ্র্যগ্রস্ত হতে হয়েছে। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কর্মহীন লোকের কীভাবে কর্মসংস্থান করা যায় এবং কীভাবেই বা ভারতীয় জনসাধারণের এই শোচনীয় দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো যেতে পারে, গুরুত্বের দিক থেকে সেইটিই হলো আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা।

স্বাধীন ভারতের তৃতীয় সমস্যা হলো তার শিক্ষা-সমস্যা। বর্তমানে ব্রিটিশ শাসনাধীনে শতকরা নব্বইজন ভারতবাসীই নিরক্ষর হয়ে রয়েছে। ভারতীয় জনসাধারণকে যথাসম্ভব শীঘ্র অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার এবং সেইসঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার জন্য চিন্তাশীল শ্রেণীসমূহকে অধিকতর সুবিধাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা-সমস্যার সঙ্গে আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাও জড়িত হয়ে রয়েছে। সেটি হলো হরফ-সমস্যা। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দু'ধরণের হরফ চলে। একটি হলো সংস্কৃত (অথবা নাগরী) হরফ, অন্যটি হলো আরবী (অথবা ফারসী) হরফ। জাতীয় কার্যাবলী ও সম্মেলনসমূহে এযাবৎ আমরা দু-ধরণের হরফই ব্যবহার করে এসেছি। এ-প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, কয়েকটি প্রদেশে এমন কয়েক ধরণের হরফ প্রচলিত রয়েছে প্রকৃতপক্ষে যা সংস্কৃত হরফেরই রকমফের। মূল হরফ দুটিই; এবং সর্বপ্রকার জাতীয় কার্যাবলী ও সম্মেলনে আমাদের এই দু ধরণের হরফই ব্যবহার করতে হয়।

ল্যাটিন হরফের প্রবর্তন করে এখন এই হরফ-সমস্যা সামাধানের একটা আন্দোলন শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ল্যাটিন হরফের সমর্থক। আধুনিক যুগে আমরা বাস করছি এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই আমাদের চলতে হবে। এ-কারণে, ইচ্ছেয় হোক্ আর অনিচ্ছেয় হোক্, ল্যাটিন হরফটা আমাদের শিখে নেওয়া দরকার। দেশের সমস্ত স্থানে যদি আমরা ল্যাটিন হরফে লেখার ব্যবস্থা করতে পারি, আমাদের সমস্যার তাহলে সমাধান হবে। যাই হোক্, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও সহযোগীরাও এই অভিমতই পোষণ করেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষের তিনটি সমস্যার আমি উল্লেখ করেছি। জাতীয় প্রতিরক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জনসাধারণকে শিক্ষাদান। এ-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান আমরা কোন্ পথে করব? দায়িত্বটা কি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে, না-কি রাষ্ট্র স্বহস্তে এই সমস্যার সমাধানদায়িত্ব গ্রহণ করবে?

এ-ব্যাপারে বর্তমানে ভারতবর্ষের জনমত হলো এই যে, এইসমস্ত জাতীয় সমস্যার, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমস্যার সামাধানভার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরে ছেড়ে দেওয়া চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধানভার যদি বেসরকারী প্রচেষ্টার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, সমস্যার সমাধান হতে তাহলে বোধ হয় কয়েক শো বছর লাগবে। ভারতবর্ষের জনমত এ-ব্যাপারে তাই খানিকটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী; সমস্যার সমাধান-দায়িত্ব এ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না, রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। শিল্প-প্রসারই হোক্, আর আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থার প্রবর্তনই হোক্, ভারতীয় জনসাধারণ যাতে অত্যল্পকালের মধ্যে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে রাষ্ট্র তার জন্য স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করে দ্রুত সংস্কারসাধন করবে, এইটেই আমাদের কাম্য।

তবে একটা কথা। সমস্যাসমাধানের ব্যাপারে নিজ পন্থানুযায়ী আমরা কাজ করতে চাই। অন্যান্য দেশে যে-সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে স্বভাবতঃই আমরা তা বিচার-বিবেচনা করে দেখব বটে, তবে ভারতবর্ষের অবস্থানুযায়ী ভারতীয় পন্থাতেই আমাদের সমস্যা সমাধান করতে হবে। ফলতঃ ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থার উপযোগী ভারতীয় ব্যবস্থারই আমরা প্রবর্তন করব।

ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশই দরিদ্র। এদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি না আমরা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে অগ্রসর হই তাহলে চীনে আজ যে বিশৃঙ্খলা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষেও সেই একই রকমের বিশৃঙ্খলা ও জটিলতার সৃষ্টি করা হবে। চীনে যে এ-অবস্থার সৃষ্টি হলো কেন, এবং কুয়োমিনটাং দল চীনা জনসাধারণের স্বার্থকেই তাদের হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাকলে কমিউনিস্ট দলের মত বৈদেশিক প্রভাবাধীন আর-একটি দলসৃষ্টির সেখানে প্রয়োজন হত কিনা, জানি না।

অভিজ্ঞতার থেকে আমরা শিক্ষালাভ করেছি। চীন যে ভুল করেছে, সে-ভুলের আর আমরা পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমাদের দেশে আজ দেখতে পাচ্ছি যে, এ-যুগের জাতীয় আন্দোলন জনসাধারণের অর্থাৎ শ্রমিক ও

কিষাণদের স্বার্থের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে নিজেকে জড়িত করেছে। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ এরাই। জনসাধারণের স্বার্থকেই আমরা হৃদয়ে স্থান দিয়েছি। এ-কারণে ভারতবর্ষে আজ কমিউনিস্ট পার্টির মত আলাদা একটি দল থাকবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ভারতবর্ষের জাতীয়তা-বাদীরা যদি জনস্বার্থকেই হৃদয়ে স্থান না দিতেন তাহলে চীনে আজ যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষেও সেই একই অবস্থার সৃষ্টি হতো।

এবারে রাষ্ট্রব্যবস্থা বা গবর্ণমেণ্ট-সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে বিবেচনা করে দেখা যাক্। সমাজবাদী পদ্ধতিতে যদি আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হয় তো রাষ্ট্রব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে করে সেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়। তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজবাদী ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কারসাধন সম্ভব নয়। এ-কারণে আমাদের পূর্ণকর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।

ভারতবর্ষে আমরা গণতান্ত্রিক সংস্থার কিছু কিছু নমুনা দেখেছি। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে কীভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কাজ চলে, তা-ও আমরা বিবেচনা করে দেখেছি। অতঃপর এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হয়েছি যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে স্বাধীন ভারতের সমস্যা-সমূহের সমাধান করা যাবে না। ভারতবর্ষের আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তা-ধারণা একটি কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থারই পক্ষপাতী। মুষ্টিমেয় ধনী অথবা চক্রান্তকারীর সেবায় নয়, জনসাধারণের সেবাতেই সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা নিযুক্ত থাকবে।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের বিবেচনায় এইরকমই হওয়া উচিত। শিল্প, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নবনব সংস্কারসাধনের পূর্ণক্ষমতাসম্পন্ন এমন একটি শাসনব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন, যে শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের সেবাতেই কর্মনিযুক্ত থাকবে।

ধর্ম ও বর্ণ সম্পর্কে স্বাধীন ভারতের মনোভাব কী হবে, সে-বিষয়েও আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এ সম্পর্কে প্রায়ই প্রশ্নাদি উত্থাপন করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে নানা ধর্ম বর্তমান। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এই সমস্ত ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন মনোভাব অবলম্বন করতে হবে, এবং ধর্মাচরণের ব্যাপারে প্রত্যেককেই পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।

বর্ণ-সমস্যা আজ আর কোনও সমস্যা নয়। তার কারণ, প্রাচীন যুগে যে

বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল আজ আর তার কোনও অস্তিত্ব নেই। এখন, এই বর্ণপ্রথাটা কী? পেশা অথবা বৃত্তির ভিত্তিতে কোনও একটা সম্প্রদায়কে কয়েকটি গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা এবং বিবাহব্যাপারে নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্য থেকে পাত্রপাত্রী নির্বাচনই হলো বর্ণপ্রথা।

এ-যুগের ভারতবর্ষে এরকম কোনও বর্ণবৈষম্য নেই। পেশা নির্বাচনের ব্যাপারে প্রত্যেকেরই আজ স্বাধীনতা রয়েছে। সুতরাং সে-অর্থে আর আজ বর্ণপ্রথার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। এর পর আসে বিবাহের প্রশ্ন। প্রাচীন যুগে বিবাহের ব্যাপারে নিজ নিজ বর্ণগোষ্ঠীর বাইরে যাওয়া হতো না। বর্তমানে বিবাহের ব্যাপারে অবাধে বর্ণ-সীমানা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। সুতরাং বর্ণপ্রথারও দ্রুত অবসান ঘটছে। বস্তুতঃ জাতীয় আন্দোলনে আমরা কখনও কারুর বর্ণ নিয়ে মাথা ঘামাইনি; এমনকি আমাদের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীদেরও কারুর কারুর বর্ণ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এ-যুগে বর্ণ সম্পর্কে আমরা কিছু ভাবিই না। স্বাধীন ভারতের পক্ষে বর্ণ কোনও একটা সমস্যাই নয়।

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা আপনাদের জানানো প্রয়োজন মনে করি। ব্রিটিশ-শক্তি পৃথিবীর সর্বত্র এই ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে, নিজেদের মধ্যেই আমরা ঝগড়াবিবাদ করে মরছি; বিশেষ করে, ধর্মের ব্যাপারে আমাদের কলহের অন্ত নেই। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এতে করে একটা মিথ্যা ধারণারই সৃষ্টি করা হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে কোনও কোনও ব্যাপারে হয়তো মতানৈক্য থাকতে পারে; কিন্তু প্রত্যেকটি দেশেই সেরকম মতানৈক্য দেখতে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর তথাকথিত প্রগতিশীল দেশগুলির কথা যদি ধরা যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ যুদ্ধ-পূর্ব ফ্রান্স অথবা হিটলার ও তাঁর দল ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেকার জার্মাণীর কথা যদি বিবেচনা করে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে এই সমস্ত দেশের জনসাধারণের মধ্যেও তীব্র বিরোধ বর্তমান ছিল। এমনকি, স্পেনে তার জন্যে পুরোদস্তুর একটি গৃহযুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু এইসমস্ত দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ ছিল বলেই যে নিজেদের হস্তে শাসনভার গ্রহণ করতে তারা অক্ষম, কেউই এমন কথা বলবে না। একমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই ইংরেজরা বলছে যে, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যেহেতু কয়েকটি বিষয়ে বিরোধ রয়েছে, অতএব স্বাধীনতালাভের তারা যোগ্য নয়। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যেসমস্ত বিবাদবিসম্বাদ রয়েছে, বহুলাংশে তা আবার ব্রিটিশ সরকারেরই সৃষ্ট। ব্রিটিশ শক্তি যে সদাসর্বদা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে সর্বপ্রকার উপায়ে বিভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে, তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কৃত্রিম

উপায়ে বিরোধসৃষ্টির জন্য এতখানি করে ব্রিটিশ শক্তি এখন বলছে যে আমরা স্বাধীনতালাভের যোগ্য নই।

এ-প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, সোভিয়েট রাশিয়ার মত একটি আধুনিক রাষ্ট্রের কথা বিবেচনা করে দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে চরিত্রগত বৈষম্য সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহুসংখ্যক জাতিকে সেখানে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রগঠন সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষেত্রে যদি তা সম্ভব হয়ে থাকে, সোভিয়েট রাশিয়া অপেক্ষা অধিকতর সমন্বিতচরিত্র ভারতবর্ষকেও সেক্ষেত্রে একজাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে না পারার কোনও কারণ নেই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের বাইরে যেখানে ব্রিটিশ প্রভাব নেই, সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখতে পাওয়া যাবে না। পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে ধর্ম বর্ণ অথবা শ্রেণীগত কোনও সমস্যাই নেই। একমাত্র ভারতবর্ষেই—অর্থাৎ ব্রিটিশ শক্তির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ যেখানে বর্তমান—এইসমস্ত বিরোধ দেখতে পাওয়া যাবে।

স্বাধীন ভারতে আমরা কী ধরণের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক্ ব্যবস্থা গঠনের পক্ষপাতী, তা আপনাদের বলেছি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের রাষ্ট্র-দর্শন কী? দশ বৎসর পূর্বে আমি "The Indian Struggle" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলাম। এ-বিষয়ে সেখানে আমি আমার অভিমত জ্ঞাপন করেছি। তাতে আমি বলেছিলাম যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করে আমাদের নূতন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একদিকে ফ্যাসিজ্‌ম্ (একে ন্যাশনাল সোস্যালিজ্‌ম্‌ও বলতে পারেন) ও অন্যদিকে কমিউনিজ্‌ম্‌য়ের বিরোধের কথা বিবেচনা করুন। দুটি ব্যবস্থার মধ্যেই যেসমস্ত কল্যাণকর দিক রয়েছে তার সমন্বয়সাধন করতে না পারার কোনও কারণ নেই। কোনও একটি বিশেষ ব্যবস্থা যে মানব-প্রগতির চূড়ান্ত পর্যায়স্বরূপ, এ-কথা বলা মূর্খতারই নামান্তর। দর্শনের ছাত্রহিসেবে আপনারা জানেন, মানব-প্রগতির কোনও বিরাম নেই; অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমাদের নূতন ব্যবস্থার সৃষ্টি করে নিতে হয়। ভারতবর্ষে তাই আমরা পরস্পরবিরোধী ব্যবস্থাসমূহের একটা সমন্বয়সাধন করতে চেষ্টা করব। বিরোধী ব্যবস্থাসমূহের কল্যাণকর বিষয়গুলির সেখানে মিলন ঘটবে।

এবারে ন্যাশনাল সোস্যালিজ্‌ম্ ও কমিউনিজ্‌ম্‌য়ের কল্যাণকর বিষয়-গুলির একটা তুলনা করে দেখা যাক। কতকগুলি গুণ উভয় ব্যবস্থার মধ্যেই বর্তমান। দুটি ব্যবস্থাই গণতন্ত্র-বিরোধী অথবা একনায়কত্ববাদী। দুটি

ব্যবস্থাই পুঁজিবাদবিরোধী। কিন্তু এই মিল সত্ত্বেও কয়েকটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। ইউরোপে ন্যাশনাল সোস্যালিজ্‌ম্‌য়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আজ কী দেখতে পাওয়া যায়? ন্যাশনাল সোস্যালিজ্‌ম্‌ জাতীয় ঐক্য ও সংহতিবিধানে এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিসাধনে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ভিত্তির উপরে যে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল, ন্যাশনাল সোস্যালিজ্‌ম্‌ তার আমূল সংস্কারসাধনে সক্ষম হয়নি।

পক্ষান্তরে কমিউনিজ্‌ম্‌য়ের ভিত্তিতে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা যাক্‌। একটি বিরাট সাফল্যের সেখানে সন্ধান পাওয়া যাবে, তা হলো তাদের পরিকল্পিত অর্থনীতি। কমিউনিজ্‌ম্‌য়ের ত্রুটি হলো এই যে, জাতীয় মনোভাবের সে মূল্য বোঝে না। জাতীয় মনোভাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে-ব্যবস্থা জনসাধারণের সামাজিক প্রয়োজন মেটাতেও সমর্থ, ভারতবর্ষে এমনই একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে চাই। অর্থাৎ সেটা হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদেরই একটা সমন্বয়স্বরূপ। আজকের জার্মাণীর ন্যাশনাল সোস্যালিস্টরা সেই সমন্বয়সাধন করতে পারেন নি।

কয়েকটি ব্যাপারে ভারতবর্ষ সোভিয়েট রাশিয়ার অনুগামী নয়। প্রথমতঃ ভারতবর্ষে শ্রেণী-সংঘর্ষের কোনও প্রয়োজন নেই। স্বাধীন-ভারতের গবর্ণমেণ্ট যদি জনসাধারণেরই মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন, তাহলে সেখানে শ্রেণী-সংঘর্ষের কোনো প্রয়োজনই ঘটবে না। রাষ্ট্রকে জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত করেই আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি।

শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যার উপরেও সোভিয়েট রাশিয়া অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষকদের দেশ। শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা অপেক্ষা কৃষক শ্রেণীর সমস্যার উপরে তাই সেখানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

আর-একটা কথাও আমরা পুরোপুরি মেনে নিতে পারি না। মার্ক্সবাদে মানব-জীবনের অর্থনৈতিক দিকটির উপরে অত্যধিক গুরুত্বআরোপ করা হয়েছে। পূর্বে-এ-দিকটিকে অবহেলা করা হতো। অর্থনৈতিক দিকটির গুরুত্ব আমরা বুঝি, কিন্তু তাই বলে এনিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোনও প্রয়োজন নেই।

আবারো বলছি, ন্যাশনাল সোস্যালিজ্‌ম্‌ ও কমিউনিজ্‌ম্‌য়ের সমন্বয়ই আমাদের রাষ্ট্রদর্শন হওয়া উচিত। ক্রিয়া ও প্রতি-ক্রিয়ার যে দ্বন্দ্ব, মহত্তর কোনও সমন্বয়ের মধ্যেই তার নিবৃত্তিসাধন করতে হবে। দ্বন্দ্বনীতি সেই

কথাই বলে। এ যদি না করা হয় তো, মানবপ্রগতি রুদ্ধস্রোত হয়ে পড়বে। ভারতবর্ষ তাই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার জন্যই চেষ্টা করে যাবে।

আন্তর্জাতিক বিধান সম্পর্কে আমাদের ধারণা কী, সেই কথা বলেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। টোকিয়োতে বারকয়েক এ-বিষয়ে আমি বক্তৃতাদান করেছি। স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক আদানপ্রদানের ভিত্তিতে পূর্ব-এশিয়ায় একটি নববিধান সৃষ্টি-সম্পর্কিত যুক্ত ঘোষণায় যেসমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আন্তর্জাতিক সমস্যা-বিচারে ব্যক্তিগতভাবে আমি যথেষ্টই আগ্রহশীল। আমাদের আন্দোলনের জন্য সমর্থন অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে আমি কাজ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি এবং এ-ব্যাপারে লীগ অব নেশন্‌স্‌য়ের কার্যাবলী পরিদর্শনের সুযোগও আমার ঘটেছে।

লীগ অব নেশন্‌স্‌য়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। এ-ব্যর্থতার কারণ কী, তা বিচার করা দেখা বাঞ্ছনীয়; তাতে আমাদের লাভই হবে। আমাকে যদি এ-ব্যর্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয় তো আমি বলব, উদ্যোক্তা রাষ্ট্রসমূহের অতিরিক্ত স্বার্থপরতা ও অদূরদর্শিতার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানকে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছে। উদ্যোক্তা রাষ্ট্রসমূহ ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অ্যামেরিকা। অ্যামেরিকা লীগের থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের হাতেই এর নিয়ন্ত্রণভার এসে পড়ে। এ-দুটি নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র নিঃস্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন না করে তার পরিবর্তে লীগ অব নেশন্‌স্‌কে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও অভীষ্টসাধনের যন্ত্রহিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। একমাত্র স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক আদানপ্রদানের ভিত্তিতেই একটি আন্তর্জাতিক বিধান গড়ে তোলা সম্ভব। এর থেকেই বলতে পারা যায় যে, যথার্থ পন্থা ও যথার্থ ভিত্তিতেই পূর্ব-এশিয়ায় কাজ শুরু করা হয়েছে। এখন যুক্ত ঘোষণার নীতি-সমূহ যাতে কার্যে পরিণত হয়, সেইটুকুর ব্যবস্থা করাই হলো আমাদের একমাত্র কর্তব্য। নীতিসমূহকে কার্যে পরিণত করা হলে এ-ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হবে। আর তা যদি না করা হয়, এ-ব্যবস্থাও ব্যর্থ হবে।

উদ্যোক্তা-রাষ্ট্রের আচরণ-দৃষ্টান্তের উপরেই এ-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করছে। উদ্যোক্তা-রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থপরতা ও অদূরদর্শিতার জন্যই লীগ অব নেশন্‌স্‌কে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে সহযোগী-রাষ্ট্রসমূহ বিশেষতঃ উদ্যোক্তা-রাষ্ট্র যদি স্বার্থপর ও অদূরদর্শী নীতি পরিহার করে চলে

এবং একটি নৈতিক ভিত্তির উপরে কাজ চালিয়ে যায়, পরীক্ষাটা তাহলে সাফল্য-মণ্ডিত না হবার কোনও কারণ নেই।

উদ্যোক্তা-রাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জাপান যে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছে, পুনর্বার আমি তার উল্লেখ করতে চাই। রাষ্ট্রের দায়িত্বের উল্লেখ কালে যুবসমাজের দায়িত্বের উপরেও আমি যথেষ্টই গুরুত্ব আরোপ করছি। আজকের যুবসমাজই ভবিষ্যতের জাতি; ভবিষ্যতের নেতৃত্বভারও তাঁদেরই গ্রহণ করতে হবে। যে-পরিকল্পনা আজ যুবসমাজের শুভেচ্ছা ও সমর্থনলাভ করছে, সমগ্র জাতিই একদিন তাকে সমর্থন করবে। যে-পরিকল্পনার পিছনে যুব-সমাজের সমর্থন নেই, স্বাভাবিকভাবেই তার মৃত্যু অনিবার্য। শেষ বিচারে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, এই নববিধানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার দায়িত্ব এ-দেশের যুবসমাজেরই। এই নববিধানের প্রবর্তনায় জাপান যে বিরাট নৈতিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে, আমার আশা ও কামনা—ছাত্রসমাজ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। জাতির ভবিষ্যৎ-প্রতিনিধি তাঁরাই

কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে উঁচু একটা নৈতিক মান অর্জন করা এবং দূরদৃষ্টি ও নিঃস্বার্থ মনোভাব নিয়ে একটি নববিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব কি না, কেউ কেউ সে-বিষয়ে সন্দিহান হতে পারেন। মানবতার উপরে আমি আস্থাশীল। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যদি নিঃস্বার্থ হয়ে পবিত্রভাবে জীবনযাপন সম্ভব হয় তাহলে একটা জাতির পক্ষেও তা সম্ভব না হবার কোনও কারণ নেই। একটা বিপ্লবের ফলে সমগ্র জাতির দৃষ্টিভঙ্গী পালটে গিয়েছে এবং সে-জাতি একটা উঁচু নৈতিক মান অর্জনে সমর্থ হয়েছে, বিশ্ব-ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। সুতরাং একটা জাতির পক্ষে সামগ্রিকভাবে সেই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্পর্কে যদি কারুর কোনও সন্দেহ থেকে থাকে তো তার সঙ্গে আমি একমত নই।

উপসংহারে আমি আবারো বলছি যে, উদ্যোক্তা-রাষ্ট্র যে বিরাট দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে, তার গুরুত্ব তাকে উপলব্ধি করতে হবে। এ-দায়িত্ব শুধু নেতৃ-বৃন্দ ও রাজনীতিকদের নয়, এ-দায়িত্ব সমগ্র জাতির। বিশেষ করে যুবসমাজ ও ছাত্রবৃন্দ—দেশের যাঁরা আশাস্থল—এ-দায়িত্ব তাঁদেরই